তৃতীয় অধ্যায়

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস ঃ পর্ব বিন্যাস ও বিষয়ানুসারে বিশ্লেষণ

"কল্লোল" পত্রিকাকে আশ্রয় করে সেকালের তরুণ কথাশিল্পীরা সাহিত্যে যে নূতন যুগ আনতে চেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। নূতন যুগের আবেগ ও মূল্যবোধকে তিনি সাহিত্যের রূপ দিয়েছিলেন। তাঁর কথাসাহিত্যের সম্ভারে প্রথম দেখা যায় ছোটগল্প। এর দুই বছর পরে তিনি উপন্যাস রচনা শুরু করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর মোট উপন্যাসের সংখ্যা তেতাল্লিশ। এই উপন্যাসগুলির মধ্যে পঁচিশটি ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল। পরবর্তী উপন্যাসগুলি ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়। এই সময়কালের মধ্যে দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। এছাড়া সমকালীন বাঙ্গালীর মানসপটে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুভূতি ও আবেগ, সমাজবাদ ও ফ্রয়েডীয় যৌনতত্ত্ব কথাসাহিত্যিকদের শিল্প চেতনাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। স্বাভাবিকভাবেই বুদ্ধদেবের উপন্যাসগুলিতে এই প্রভাব পড়েছিল। তাই তাঁর প্রথমদিকের উপন্যাসে নর-নারীরা যেভাবে বিচরণ করেছিল শেষের দিকের উপন্যাসে তা দেখা যায় না। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালের উপন্যাসের চরিত্রগুলির স্বভাব, চিন্তা চেতনা ও জীবনাচরণেরও পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। সুতরাং এই পরিবর্তনের ফলে তাঁর প্রথম ও শেষের দিকের উপন্যাসের বিভাজনের কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই। বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের এইসব দিক লক্ষ্য করে তাঁর উপন্যাসগুলিকে দুটি পর্বে ভাগ করা হল ঃ

ক) <u>বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের প্রথম পর্ব (১৯২৮-৪৪ খ্রীঃ)</u>

খ) <u>বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব (১৯৪৫-৭২ খ্রীঃ)</u>

বুদ্ধদেব বসুর প্রথম পর্বের (১৯২৮-১৯৪৪ খ্রীঃ) উপন্যাসগুলি কাল অনুযায়ী উল্লেখ করা হলঃ

সাড়া (১৯২৮-৩০ খ্রীঃ), অকর্মণ্য (১৯২৯-৩১ খ্রীঃ), অনেকরকম (১৯৩০ খ্রীঃ), যবনিকা পতন (১৯৩১ খ্রীঃ), রডোডেনড্রন গুচ্ছ (১৯৩১ খ্রীঃ), মন-দেয়া-নেয়া (১৯৩২ খ্রীঃ), অসূর্য্যম্পশ্যা (১৯৩২ খ্রীঃ), ধূসর গোধূলি (১৯৩২ খ্রীঃ), পরস্পর (১৯৩৪ খ্রীঃ), সানন্দা (১৯৩৩ খ্রীঃ), আমার বন্ধু (১৯৩৩ খ্রীঃ), যেদিন ফুটলো কমল (১৯৩৩ খ্রীঃ), হে বিজয়ী বীর (১৯৩৩ খ্রীঃ), এলোমেলো (১৯৩৩ খ্রীঃ), একদা তুমি প্রিয়ে (১৯৩৩ খ্রীঃ), বাসর ঘর (১৯৩৩ খ্রীঃ), বাড়ি বদল (১৯৩৪ খ্রীঃ), সূর্যমুখী (১৯৩৪ খ্রীঃ), লালমেঘ (১৯৩৪ খ্রীঃ), চৌরঙ্গী (১৯৩৫ খ্রীঃ), পরিক্রমা (১৯৩৬ খ্রীঃ), পারিবারিক (১৯৩৬ খ্রীঃ), দুই ঢেউ এক নদী (১৯৩৬ খ্রীঃ), কালো হাওয়া (১৯৩৯-৪০ খ্রীঃ), অদর্শনা (১৯৪৪ খ্রীঃ)। এছাড়া অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহযোগে বুদ্ধদেব বসু আরো দুটি উপন্যাস লিখেছিলেন। উপন্যাস দুটি হল "বিসর্পিল" (১৯৩২ খ্রীঃ)ও "বনশ্রী"(১৯৩৩ খ্রীঃ)।

বুদ্ধদেব বসুর দ্বিতীয় পর্বের (১৯৪৫-১৯৭২ খ্রীঃ) উপন্যাসগুলি কাল অনুযায়ী সাজানো হল ঃ

বিশাখা (১৯৪৫ খ্রীঃ), তিথিডোর (১৯৪৭-৪৯ খ্রীঃ), হাওয়া বদল (১৯৫০ খ্রীঃ), অন্য কোনখানে (১৯৫০ খ্রীঃ), মনের মতো মেয়ে (১৯৫১ খ্রীঃ), নির্জন স্বাক্ষর (১৯৫১ খ্রীঃ), মৌলিনাথ (১৯৫২ খ্রীঃ), নীলাঞ্জনের খাতা (১৯৫৬ খ্রীঃ), শেষ পাণ্ডুলিপি (১৯৫৬ খ্রীঃ), পাতাল থেকে আলাপ (১৯৬৭), রাত ভ'রে বৃষ্টি (১৯৬৬-৬৭ খ্রীঃ), গোলাপ কেন কালো (১৯৬৭-৬৮ খ্রীঃ), আয়নার মধ্যে একা (১৯৬৮ খ্রীঃ), শোনপাংশু (১৯৬৯ খ্রীঃ), বিপন্ন বিস্ময় (১৯৬৯ খ্রীঃ), প্রভাত ও সন্ধ্যা (১৯৭০-৭১ খ্রীঃ), রূকমী (১৯৭১-৭২ খ্রীঃ), এক বৃদ্ধের ডায়েরী (১৯৭২)।

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের বিষয় অনুসারে শ্রেণী বিভাগ

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসকে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ভাগ করার পর এবার তাঁর উপন্যাসকে আমরা বিষয় অনুসারে ভাগ করবো। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, তাঁর উপন্যাসের বিষয় ভাবনার মূল সুর প্রায় একই রকম। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালের লেখা ও পরবর্তী কালের লেখা উপন্যাসগুলির কিছু বিষয় ভাবনা ও চরিত্রের চেতনার সজীব ও গাঢ় অনুভূতি লক্ষ করা যায়। এই অনুভূতি তাঁর উপন্যাসকেও

গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ফলে তাঁর উপন্যাসে ঘটনা ও নর-নারীর জীবন যাত্রায় আলাদা বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে দেখা যায়। এই পরিবর্তন সূত্রে তাঁর উপন্যাস গুলিকে বিভিন্ন বিষয় ও বৈশিষ্ট্যের গোত্রে ফেলে আলাদা করা যেতে পারে।

প্রথম পর্বের (১৯২৮-৪৪ খ্রীঃ) উপন্যাসের বিষয় অনুসারে শ্রেণীবিন্যাস করা হল।

ক) আত্মমুখী স্বপ্নাবিষ্ট রোমান্টিক উপন্যাস ঃ

সাড়া, রডোডেনড্রন গুচ্ছ, ধূসর গোধূলী, সানন্দা, হে বিজয়ী বীর, একদা তুমি প্রিয়ে, অসূর্য্যম্পশ্যা, সূর্যমুখী, বাড়িবদল, পরস্পর, এলোমেলো, অনেক রকম।

খ) দাম্পত্য জীবন ও বিবাহোত্তর প্রেমের উপন্যাস ঃ

লাল মেঘ, রূপালি পাখি, কালো হাওয়া, চৌরঙ্গী।

গ) দেহ চেতনার যন্ত্রণা ও রহস্য সূচক উপন্যাস ঃ

যবনিকা পতন, মন-দেয়া-নেয়া, সূর্যমুখী।

ঘ) বিশুদ্ধ প্রেমের উপন্যাস ঃ

অকর্মণ্য, যেদিন ফুটলো কমল, পরিক্রমা, আমার বন্ধু, পারিবারিক, দুই ঢেউ এক নদী।

ঙ) মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস

অদর্শনা, বাসর ঘর।

এবার দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসগুলিকে বিষয়ানুসারে শ্রেণী বিভাগ করা হল ঃ

১) চেতনা মূলক উপন্যাস

রুকমী, আয়নার মধ্যে একা, নির্জন স্বাক্ষর, হাওয়া বদল

২) জীবনাদর্শমূলক উপন্যাস

মৌলিনাথ, নীলাঞ্জনার খাতা, প্রভাত ও সন্ধ্যা, শোনপাংশু

৩) দাম্পত্য জীবনের প্রেম ও নূতন পথের দিশারী

শেষ পাণ্ডুলিপি, রাত ভ'রে বৃষ্টি, বিপন্ন বিস্ময়, গোলাপ কেন কালো।

৪) প্রেমের উপন্যাস

বিশাখা, তিথিডোর, পাতাল থেকে আলাপ, এক বৃদ্ধের ডায়েরী, মনের মতো মেয়ে।

বুদ্ধদেবের প্রথম পর্বের (১৯২৯-১৯৪৪ খ্রীঃ) উপন্যাসের বিষয়ভাবনা বিশ্লেষণ ঃ

ক) আত্মমুখী স্বপ্নাবিষ্ট রোমান্টিক উপন্যাস

এই পর্বটি মূলতঃ তিরিশের দশকের। এই সময় কল্লোলের চেতনাগুলি ভালোভাবে ধরা পড়েছিল। এই সময় বুদ্ধদেবের উপন্যাসের প্রাণশক্তি নিহিত ছিল কল্লোলের মধ্যে। বুদ্ধদেবের উপন্যাসের এই পর্যায়ের একটি বৈশিষ্ট্য হল সামাজিক ও বাস্তব জীবনে শিথিলতা। ব্যক্তির চেতনা, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, ব্যক্তি হৃদয়ের গভীর পিপাসা ইত্যাদি নানা কাহিনী ও চরিত্রের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কল্লোলের অধিকাংশ লেখকেরই মতো বুদ্ধদেবের ব্যক্তি হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও চেতনার কারুকার্য দ্বারা মণ্ডিত ছিল। এখানে সমাজ সংস্কারের অস্তিত্ব নেই, এখানে লেখকের জীবন ভাবনাই বড় হয়ে উঠেছে। নিজেকে নিয়ে সংশয়, স্বপ্ন, কামনা এখানে প্রবল হয়ে উঠেছে। এইসব ভাবনার মধ্যে দিয়ে তাঁর ব্যক্তি জীবনের ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। "সাড়া" উপন্যাসে সাগর, "যেদিন ফুটল কমল" উপন্যাসে পার্থপ্রতিম, "বাসর ঘর"-এ পরাশর, "একদা তুমি প্রিয়ে"-এর পলাশ এদের সকলের চিন্তা ভাবনা ও অনুভূতির মধ্যে দিয়ে লেখক নিজেকেই তুলে ধরেছেন। কবি যেন রোমান্টিক স্বপ্ন বুকে নিয়ে বাঁচতে চেয়েছেন। আশা নিরাশা, সংশয় ও স্বপ্ন, ভাঙ্গা গড়ার মধ্যে বুদ্ধদেব নিজের তরুণ চিত্তকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। এই তারুণ্য বা যৌবন ধর্মের মর্ম কথাই ছিল তাঁর এই স্বপ্নাবিষ্ট, আত্মমুখী, রোমান্টিক উপন্যাসের সার কথা। "সাড়া" থেকে শুরু করে এই পর্বের প্রায় সর্বত্র বুদ্ধদেবের ব্যক্তি জীবনের ছায়াপাত লক্ষ করি। আত্মমুখী রোমান্টিক কবিপ্রাণতা ও বিষন্ন স্বপ্ন জগতের মধ্যে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে বিচরণ করতে দেখি। এই আত্মমুখী রোমান্টিক কাব্যময়তার সৌরভ বুদ্ধদেবের উপন্যাসকে দিয়েছে আলাদা স্বাদ। প্রচলিত উপন্যাস থেকে এখানেই বুদ্ধদেবের উপন্যাসের অভিনবত্ব। তাঁর উপন্যাসে ঘটনার ঘনত্ব ও জটিলতা নেই, বুদ্ধদেব সে বিষয়ে না তাকিয়ে চরিত্রের মনোজগতকে আলোকিত করেছেন। তাঁর ব্যক্তি জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রতিচ্ছবি বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এই ছবি তুলে ধরতে গিয়ে প্রেমকে অধিক মাত্রায় প্রাধান্য দিতে হয়েছে। তিনি প্রেমের উন্মাদনা এমনভাবে

উপন্যাসে তুলে ধরেছেন যা তারুণ্যের উদ্দাম উচ্ছলতারই নামান্তর। তিনি ঘটনার চেয়ে নর-নারীর প্রেমের দিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর এই আবেগ সঞ্চারী মনোভাব "সাড়া " উপন্যাসে দেখতে পাই। আবার "মন-দেয়া-নেয়া"তে, প্রত্যেকটি নারী পুরুষ গল্প বলার ছলে একে অপরকে ভালোবেসে ফেলেছে। "যেদিন ফুটলো কমল" উপন্যাসে শ্রীলতাকে ভালোবাসতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসুর ব্যক্তিমনের চিন্তা ভাবনা যে অসীম ও চিরন্তন - তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

"সাড়া" উপন্যাসটি রচিত হয় ১৯২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় জানুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে। প্রকাশক শ্রী আশুতোষ ঘোষ, গুপ্ত ফ্রেন্ডস এন্ড কোং, ১১, কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা। প্রথম সংস্করণ - ১৯৩০, দাম - ২ টাকা। শ্রী গৌরাঙ্গ প্রেস প্রিন্টার - সুরেশ চন্দ্র মজুমদার, ৭১/১ মির্জাপুর স্ট্রীট, কোলকাতা। বই এর প্রচ্ছদ সজ্জা শ্রী অনিল কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের করা। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৭ সালে। কবিতা ভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কোলকাতা। মূল্য ৪ টাকা।

বুদ্ধদেব বসুর প্রথম উপন্যাস "সাড়া" (১৯২৮-২৯)। এই উপন্যাস রচনাকালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র কুড়ি। তাঁর তেতাল্লিশটি (৪৩) উপন্যাসের মধ্যে "সাড়া" সাধুভাষায় রচিত প্রথম উপন্যাস। এরপর সাধুভাষায় বুদ্ধদেব আর কোনো উপন্যাস রচনা করেন নি। এই সময় "প্রগতি" পত্রিকা প্রকাশ পায়। তিনি "প্রগতি" পত্রিকার চাহিদা মেটানোর জন্য "সাড়া" রচনা করেন। ১৯২৮ সালে উপন্যাসটি লেখা শুরু করেন এবং ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস রূপে প্রকাশিত হয়। "প্রগতি"-এর সম্পাদকের উপদেশ মতই তিনি উপন্যাস রচনায় মন দিয়েছিলেন।

উপন্যাসটির উৎসর্গ পত্রে লেখা ছিল -

"এই আমার প্রথম উপন্যাস
শ্রী অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তকে
দিলাম
যে লেখকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা
সেই মানুষের প্রতি অনুরাগের সমান
এ-বই তাঁর উপযুক্ত বলে নয়,
আমার প্রথম বলে।"

২৫/০১/১৯৩০
শ্রী বুদ্ধদেব বসু। - ১

"সাড়া" উপন্যাসটি পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রত্যেকটি খণ্ডের আলাদা নামকরণে শিরোনাম আছে। আর প্রত্যেকটি খণ্ড আলাদা ক্রমিক সংখ্যা দ্বারা খণ্ডান্তর করা হয়েছে।

প্রথম খণ্ড - ঘুম পাড়ানি গান (১, ২, ৩, ৪)

দ্বিতীয় খণ্ড - কাক স্নান (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬)

তৃতীয় খণ্ড - সোনার শিকল (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬)

চতুর্থ খণ্ড - অবগাহন (১, ২, ৩, ৪, ৫)

পঞ্চম খণ্ড - সাড়া (১, ২, ৩)

এই উপন্যাসটির প্রথম থেকে তৃতীয় খণ্ড পর্যন্ত "প্রগতি"তে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। শেষ খণ্ড দুটি ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ পেয়েছিল। বুদ্ধদেব বসুর এই "সাড়া" উপন্যাস সেই সময়কার পাঠক ও সাহিত্যিক মহলে আলোড়ন তুলেছিল। উপন্যাসটি অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিল। এই অভিযোগ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন -

"বর্তমান কালে যাঁরা প্রথম এ-বই পাঠ করবেন তাদের মনে বরং আপত্তি জাগতে পারে যে এর পাত্র-পাত্রীরা বিদেহ এবং নির্বস্তুক। তরুণ বয়সে রচিত উপন্যাসের এটাকে একটি সামান্য লক্ষণ বলা যায়, তবু একথাও সত্য যে মানুষের মৌল প্রকৃতির বদল হয় না, অন্তবর্তী তিরিশ বছরে আমার রচনায় যে মানসতার বিবর্তন ঘটেছে তার অঙ্কুরোদ্‌গম "সাড়া"তে লক্ষণীয় নয় তা নয়। সাগরের ভাবুক স্বভাব আমার উপন্যাসের নায়কদের কুলক্ষণ, তাঁর শৈশব জীবন নগরপ্রীতি আমার পরবর্তী রচনায় বার বার হানা দিয়েছে, প্রেমের চরম সার্থকতা যে দুঃখেই এই ধারণা আমি এখনো কাটাতে পারি নি"

- ২

"সাড়া" উপন্যাসের প্রথমে উপন্যাসের নায়ক সাগরের মায়ের যে স্বপ্ন দেখার কথা রয়েছে তা ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ সংখ্যায় "শনিবারের চিঠিতে" অশ্লীল বলে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া উপন্যাসের আরো অনেক খণ্ডে এই অশ্লীলতা ছড়িয়ে আছে বলে অনেক সমালোচক মনে করেন। এবার আমরা "সাড়া" উপন্যাসের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত অভিযোগের সত্যতা ও তার শিল্প শৈলী তুলে ধরবো।

সাগর এই উপন্যাসের নায়ক। সাগরের বাবা ব্যোমকেশ বিখ্যাত আইন ব্যবসায়ী। তার মায়ের নাম মলিনা। সে ছিল গৃহবধূ। সাগর নিতান্ত দুর্বল ও ভীরু প্রকৃতির। সঙ্গী বলতে ছিল প্রতিবেশী হরনাথবাবুর মেয়ে লক্ষ্মী নামে এক বালিকা। তার কাছেই ছিল সাগরের মনের টান, সে ছিল তার গল্প বলার সাথী। সাগরের জ্ঞান ও বুদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী বাবা-মার সঙ্গে অন্যত্র চলে যায়। এদিকে সাগরের মা মলিনার স্নেহ স্পর্শে সাগর প্রতিপালিত হয়। এই সময়ে তার জীবনের উন্মুক্ত আকাশ যেন সাগরকে চেপে ধরে। কারণ শিশু সাগরের এই আট বছর বয়সেই মায়ের মৃত্যু হয়। তারপর সাগরের পিতা ব্যোমকেশ তাকে স্কুল জীবনের পড়া শেষ করিয়ে কোলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি করায়। কলেজের হোষ্টেলে সত্যবান নামে এক বন্ধুর সংস্পর্শে বিভিন্ন সাহিত্য আসর ও অভিজাত পরিবারের সঙ্গে সাগরের পরিচিতি হয়। ইতিমধ্যে কলেজে সাহিত্যিক হিসাবে সাগরের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অভিজাত পরিবারের মেয়ে পত্রলেখার সঙ্গে তার এই ভাবেই পরিচয় হয়। এই পরিচয় থেকেই প্রেম, প্রেম থেকেই বিবাহের প্রস্তাব আসে সাগরের কাছে। পত্রলেখার মায়ের তরফ থেকে বিয়ের জোর তাগিদ সাগরের আত্মসম্মানে আঘাত করে। এই অপরাধের ঘটনা লোকমুখে প্রচারিত হয়। সাগরের কাছে সত্যবান একনিষ্ঠ বন্ধু। সত্যবানের পরামর্শ মতো সাগর বাড়ি ফিরে আসে। বাড়িতে বাবার আন্তরিক প্রচেষ্টায় মণিমালা নামে এক গ্রাম্য মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। সে বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই সত্যবানের পত্র পেয়ে সাগর কলকাতার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। সাগর আবার কোলকাতায় গিয়ে সত্যবানের পতিতা বান্ধবী নির্মলার বাড়িতে গিয়ে উঠল। কলেজ শিক্ষক মিহিরবাবুর সঙ্গে সাগরের ছিল নিবিড় সম্পর্ক। ঘটনাক্রমে বাল্যকালের খেলার সাথী লক্ষ্মীকে এখন মিহিরবাবুর স্ত্রী হিসাবে সাগর দেখতে পায়। পুরোনো সঙ্গী লক্ষ্মীকে দেখতে পেয়ে সাগরের শুরু হয় বাল্যকালের স্মৃতি রোমন্থন। এই সূত্রে লক্ষ্মী ও সাগরের অবাধ মেলামেশা শুরু হয়। এই ঘটনায় মিহিরবাবু ছিল নীরব দর্শক মাত্র। উপন্যাসের শেষ অংশে দেখি লক্ষ্মী সাগরের কাছে চলে যায়। এটাই উপন্যাসের মূল বিষয়।

বুদ্ধদেব বসু উপন্যাসের প্রথমে সাগর ও খেলার সঙ্গী লক্ষ্মীর মধ্যে বন্ধুত্ব দেখিয়েছেন। থিয়েটার দেখে তারা একই ঘরে রাত কাটিয়েছে। যদিও তারা ছিল সেই সময় বয়সে নবীন। তাদের মধ্যে লেখক যে বর্ণনা দিয়েছেন তা যৌন সাড়ার যেন সূচনালগ্ন। তারপর উপন্যাসের একেবারে শেষ খণ্ডে সেই বাল্য সাথী লক্ষ্মীর সঙ্গে সাগরের দেখা। এখন লক্ষ্মী সাগরের কলেজের অধ্যাপক মিহিরবাবুর স্ত্রী, কিন্তু সাগর

যৌবন উন্মাদনায় লক্ষ্মী যে নিজের কলেজ শিক্ষকের স্ত্রী- একথা ভুলে যায়। সাগরের মনে কোন সংযম লক্ষ করা যায় না। কোন সামাজিক বাধা তাদের অবৈধ মেলামেশায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে নি। প্রথাগতভাবে শিক্ষকের প্রতি সম্মান দিতেও সাগরের বোধে আসে না। তারা আপন যৌবন জোয়ারে সন্তরণরত যেন দুটি প্রাণী। লক্ষ্মীর মনেও কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই। সামাজিক নিয়ম নীতি উপেক্ষা করে লক্ষ্মী সাগরের ঘরে উপস্থিত হয়েছে। জীবনের প্রতি তার যেন অনীহা। মিহিরবাবুর গবেষণায় লক্ষ্মী যেন ক্লান্ত। সাংসারিক জীবনে মিহিরবাবুর কাছ থেকে কোন সুখ লক্ষ্মী উপভোগ করে নি। সেইসঙ্গে লক্ষ্মী তার পুরোনো সঙ্গীকে পেয়ে ভুলে গিয়েছিল বিবাহিত স্ত্রীর বাধা-নিষেধ। তাই সে নিজেকে সাগরের কাছে সমর্পণ করে দেয়। আবার মিহিরবাবু তাদের প্রেমের মধ্যে এক অতীত প্রেমের স্মৃতি দেখতে পায়। তাই নিজেকে সে গুটিয়ে রেখেছিল। এছাড়া উপন্যাসের "কাকস্নান" খণ্ডে বুদ্ধদেব বসু পত্রলেখা নামে একটি নারী চরিত্র অঙ্কন করেছেন। সাগরের আত্মমর্যাদাবোধ যে এত প্রবল পত্রলেখা চরিত্র না থাকলে তা উপলব্ধি করা যেত না। সাগর চরিত্রের পরিপূর্ণতা দিতে লেখক যেন পত্রলেখা চরিত্রের পরিকল্পনা করেছেন।

বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসে প্রথাগত সামাজিক বিবাহ অপেক্ষা যৌবন তরঙ্গে উদ্বেলিত নর-নারীর সম্পর্কের চিত্র অঙ্কন করেছেন। তাই সাগর চরিত্রটিকে বিবাহিত স্ত্রী মণিমালার সঙ্গে সম্পর্কান্বিত করে সংসারের প্রতি কোন আসক্তি হতে লেখক দেখান নি। প্রথমদিকে পত্র দিয়ে খোঁজ নিলেও শেষের দিকে কোন পত্রের দ্বারাও বিবাহিত স্ত্রীর কোন খোঁজ খবর নেওয়ার তাগিদ তার মধ্যে লক্ষ করা যায় না।

সাগর চরিত্রের পাশাপাশি উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু আরেকটি ভাগ্যতাড়িত যুবক সত্যবানের চরিত্র অঙ্কন করেছেন। সত্যবান-নিষিদ্ধ পল্লীর মেয়ে নির্মলার কাছে যাতায়াত করেন। সত্যবান তাকে বিবাহ করে নি। কিন্তু অবৈধ সম্পর্কের গভীরতায় নির্মলা স্বামী-স্ত্রীর মর্যাদা দাবী করে। সত্যবানের দূরদর্শিতা ছিল অসাধারণ। সে সাগরকে যেন পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। সত্যবান ছিল সাগরের শুভাকাঙ্ক্ষী। তারই পরামর্শে সাগর দ্বিতীয়বার কোলকাতায় চাকুরী পেয়েছিল। উপন্যাসে সাগর-লক্ষী, নির্মলা-সত্যবান, কন্দর্প-পত্রলেখা এই ত্রয়ী প্রেম যুগলের মাঝে শারীরিক সম্পর্ক নর-নারীর জীবনে কতখানি মাত্রা পায় লেখক তা দেখিয়েছেন।

উপন্যাসের প্রথমেই যৌন উত্তেজনাপূর্ণ একটি স্বপ্ন দেখেছে সাগরের মা মলিনা। সাদা বরফের দেওয়ালে শরীরের ভার ছেড়ে দিয়ে উপরে ঠেলে ওঠার দৃশ্য মলিনার মধ্যে দেখতে পাই। সাগরের কান্নার মধ্যে দিয়েই মলিনার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। এই স্বপ্নময় পরিবেশ দিয়েই উপন্যাসটি আরম্ভ হয়েছে। এখান থেকেই বুদ্ধদেবের অশ্লীলতার অভিযোগের অঙ্কুরলগ্ন বলে অনেক সমালোচক মনে করেন। লেখক জীবনের প্রায় শুরু থেকেই অশ্লীলতার অভিযোগ বুদ্ধদেবের পিছনে তাড়া করে ফিরছে। আজকের দিনে তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমাদের মনে হয়, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের মূল কারণ যৌনতার প্রকাশ নয়, অবিবাহিত নর-নারীর প্রণয়ের নির্লজ্জ স্বীকৃতি। অশ্লীলতার প্রথম অভিযোগ আসে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে। তখন বুদ্ধদেব বসু স্কুলে পড়েন। কলেজিয়েট স্কুলে পড়াকালীন মাষ্টারমশাই তাঁর ইংরাজী গল্প "Joede Vivre" এর দ্বিতীয় অংশ স্কুল ম্যাগাজিনে ছাপতে আপত্তি করেন। কারণ এই গল্পের মধ্যে কিছু অশ্লীল সংলাপ শিক্ষক মহাশয় দেখতে পান। তার পর "রজনী হ'লো উতলা" (১৯২৬ খ্রীঃ) নিয়ে তোলপাড় করার অভিযোগে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে এ বিষয়ে মধ্যস্থতা করতে হয়। এরপর "সাড়া" উপন্যাস- যার নূতন সংস্করণের ভূমিকায় বুদ্ধদেব লিখেছিলেন -

"আজকের দিনের পাঠকরা শুনে নিশ্চয় বিস্মৃত হবেন যে প্রথম প্রকাশকালে "সাড়া" চিহ্নিত হয়েছিল অশ্লীলতার দুঃসহ নিদর্শন রূপে। কেউ এতে ঈডিপাস-এষণা আবিষ্কার করেছিলেন, কেউবা, অজাচার"। কিন্তু এই প্রথম (যদিও এই শেষ নয়) সেই অশ্লীলতার অভিযোগ গড়াল আদালত হয়ে পুলিশ পর্যন্ত।"- ৩

এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছেন আদালতে এই অশ্লীলহীনতার প্রমাণ দিতে গিয়ে এক বিখ্যাত উকিলকে ধরেছিলেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে "আনন্দবাজার পত্রিকা"-র সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ১৯৩৩ সালের ১৪ই জানুয়ারী সম্পাদকীয় কলমে লিখেছিলেন -

"উপন্যাসের নর-নারীরা কিভাবে প্রেম নিবেদন বা হৃদয় বিনিময় করিবে, তাহার হুদ্দা যদি পুলিশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা হইলে বাংলা সাহিত্যে অতি শোচনীয় দুর্দিন সমাগত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রীমান বুদ্ধদেব বসু উচ্চশিক্ষিত; বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান তিনি পাইয়াছেন এবং অল্প বয়সেই বাংলা সাহিত্যে তাঁহার রচনাগুলি একটি

বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। পান্ডিত্য ও প্রতিভা সত্ত্বেও তিনি দরিদ্র বলিয়াই যে এইভাবে নির্যাতিত হইলেন, ইহা অত্যন্ত দুঃখের কথা" - ৪

সুতরাং দেখা যায় বুদ্ধদেব বাবুর প্রথম উপন্যাস "সাড়া"- তে উপন্যাস রচনার-বিশেষত্বগুলি দোষগুণ নিয়ে ফুটে উঠেছিল। এবার এই "সাড়া" উপন্যাসের বিভিন্ন সংস্করণের যে গ্রহণ-বর্জন ঘটেছিল তা তুলে ধরা প্রয়োজন। দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৪৭ খ্রীঃ) এই গ্রহণ-বর্জনে বুদ্ধদেবের জীবনের একটা দিক লক্ষ করা যায়। কারণ তিনি পূর্ববঙ্গ থেকে এই "সাড়া" উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলেন। কাজেই তখন যে ভাষা ব্যবহার করেছিলেন বিভিন্ন সংস্করণে পরিবর্তন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন - আছাড়িয়া - আচড়াইয়া, চিপতে - নিংড়োতে, ছেলে পিলেরা - ছোটরা, পানে - দিকে, বায়োস্কোপ - সিনেমা, ব্যাচেলর - অবিবাহিত, মাজায় - কোমরে, স্টেজ - রঙ্গমঞ্চ। এছাড়া এই উপন্যাসে কয়েকটি স্থান, ব্যক্তি এবং রাস্তার নাম পরিবর্তিত করেছেন, যেগুলি বিভিন্ন সংস্করণের পাঠ নির্দেশে দেখা যায়। বুদ্ধদেব বসুর এই উপন্যাসে বিভিন্ন ঘটনায় তার ব্যক্তিগত জীবনের শৈশব স্মৃতি অনেকটাই ছিল। বুদ্ধদেব বসু আমার ছেলেবেলা গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন -

"আমার ছেলেবেলার কথা আগে অনেকবার লিখেছি। "সাড়া" উপন্যাসের প্রথম অংশে নোয়াখালির ঘটনা রয়েছে" - ৫

এছাড়া "সাড়া " উপন্যাসে সাগরের থিয়েটার দেখার অভিজ্ঞতার সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর ছেলেবেলার বর্ণনা ও "ঘুম পাড়ানির গান" খন্ডের "শর"-এর যে দৃশ্য আছে তা বুদ্ধদেব বসুর ছেলেবেলার সঙ্গে তুলনীয়। বুদ্ধদেব বসুর "সাড়া" উপন্যাসের রচনার সঙ্গে আরেকটি ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়। তা হলো ১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রবোধকুমার সান্যালের "দুয়ে আর দুয়ে চার" অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের "বিবাহের চেয়ে বড়" আর "প্রাচীর ও প্রান্তর", এবং "এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে" - এই চারখানা সদ্য প্রকাশিত উপন্যাসের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ এসেছিল। এই অশ্লীলতা বুদ্ধদেব বসুর ষড়যন্ত্রে কিনা সন্দেহ করা হয়েছিল। তাকে লাল বাজার থেকে ডাকা হয়েছিল, কারণ বুদ্ধদেব বসুর "সাড়া" উপন্যাসের সঙ্গে প্রবোধকুমার সান্যালের "দুয়ে আর দুয়ে চার" এর সাদৃশ্য দেখে সন্দেহ করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানেও বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে সন্দেহের সত্যতা সম্পর্কে ভুল প্রমাণিত হয়।

"রডোডেনড্রন গুচ্ছ" উপন্যাসটি ১৯৩২ সালে রচিত হয়, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ঐ সালের নভেম্বর মাসে। এন.এম. রায়চৌধুরী এন্ড কোং। ক্রাউন সাইজ ৪ + ১৬৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ২ টাকা। এই উপন্যাসটি "প্রগতি" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

"রডোডেনড্রন গুচ্ছ" উপন্যাসটি আটটি পরিচ্ছেদ-এ বিভক্ত। উপন্যাসের প্রথমে দেখি মৃণালিনীর আভিজাত্যপূর্ণ সংসার। অল্প বয়সে মৃণালিনীর স্বামী মারা গিয়েছিল। সে দুই কন্যাকে নিয়ে সংসার চালায়। তার দুই কন্যা নীলিমা ও শীলা। নীলিমার প্রিয় বান্ধবী সুমিত্রা। এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলা প্রয়োজন যে, সুমিত্রার সঙ্গে নীলিমার সম্পর্ক খুবই গভীর ছিল। মৃণালিনী নিজের মেয়েদের স্বভাব চরিত্র ও মেজাজ-মর্জির কথা সুমিত্রাকে জানায়। উপন্যাসে মৃণালিনীর সন্ন্যাসীর প্রতি আসক্তি দেখা যায়। এখানে মৃণালিনীর যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে দেখি, সে একজন বাস্তব জ্ঞানহীন আবেগপ্রবণ মহিলা। যার ফলে নিজের মেয়ের সামনে আবেগ প্রকাশ করতে গিয়ে সে তিরস্কৃত হয়।

উপন্যাসের প্রথমে দেখি মৃণালিনীর সংসারে নীলিমা ও শীলা উচ্চ শিক্ষিতা, সংস্কৃতজ্ঞ দুই মেয়ে। তাদের খ্যাতি, সম্মান, সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। আরো দেখি উপন্যাসের প্রথমেই কলেজ বান্ধবী সুমিত্রাকে নীলিমা বাড়িতে নিয়ে আসে। সুমিত্রার মা, বাবা নেই, সে দাদামশাই-এর কাছে মানুষ। শিক্ষা জীবন কোলকাতার বোর্ডিংএ এসে শুরু হয়। উচ্চশিক্ষার শেষে সে এই প্রথম কলেজের হোষ্টেল ছেড়ে নীলিমার বাড়িতে এসেছে। এই উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে অষ্টম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত সুমিত্রাকে নীলিমার বাড়িতেই দেখি।

উপন্যাসের মধ্যাংশে জানতে পারি সুমিত্রা একজন শিক্ষিকা। সাহিত্য রচনা তার প্রিয় বিষয়। সুমিত্রার প্রাবন্ধিক হিসাবে খ্যাতি ছিল। নীলিমার মাকে সে পিসিমা বলতো পিতামাতা হারা নীলিমা দাদামশায়ের কাছে প্রতিপালিত হয়। দাদামশাই এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল শুধু মানি অর্ডারের। নীলিমার জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল সুমিত্রা। উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকে আমরা নটরাজ নাগ, চতুর্থ পরিচ্ছেদে পুরন্দর সেন, বীরেন চক্রবর্ত্তী, পঞ্চম পরিচ্ছেদে চন্দ্রিকা, ষষ্ঠ পরিচ্ছদে ধীরাজপ্রসন্ন মহলনবীশ প্রভৃতি চরিত্রগুলির দেখা পাই। উক্ত পুরুষ চরিত্রের সঙ্গে নীলিমা, শীলা, সুমিত্রা ও চন্দিকা এই চারটি নারী চরিত্র সবসময় সাহিত্য আলোচনা, রাজনীতি,

গালগল্পের মধ্যে দিয়ে সময় অতিবাহিত করতে দেখা যায়, এবং এর মধ্যে দিয়েই উপন্যাসটি শেষ হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু প্রচলিত উপন্যাসের লিখন ধারা থেকে এ উপন্যাসে যেন বেরিয়ে এসেছেন। চরিত্রগুলি একে অপরের সঙ্গে গল্প বলে। তাদের সাহিত্য সমীক্ষা, কাব্য লেখার প্রতি ঝোঁক আমরা উপন্যাসে লক্ষ করি। প্রতিটি চরিত্র স্বাধীন। পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের অন্যতম মাধ্যম ছিল গল্প বলা। "ভালোবাসি" শব্দটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বুদ্ধদেব বসু একটি সাহিত্য আসরের যেন আয়োজন করেছেন।

নটরাজ নাগ উপন্যাসের একটি ভোগী চরিত্র। ভোগবিলাস ছিল তার একমাত্র অভিপ্রায়। আদর্শহীন, স্থির বুদ্ধিহীন, একটি উচ্ছৃঙ্খল মনের মানুষ ছিল সে। বাইরে সে ইংরেজ বিরোধী কিন্তু ভিতরে ছিল স্বদেশের প্রতি ঘৃণা। নিজে ইংরেজ সরকারের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে সে এখন ডাক্তারী করে। সে ছিল নীলিমার সম্পর্কে মামা কিন্তু নীলিমা তার আচরণে বিরক্ত হয়ে ওঠে। প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর নটরাজ নাগ সামাজিক প্রথায় কোন মেয়েকে স্ত্রী রূপে মেনে নিতে নারাজ। সুন্দরী অপরের স্ত্রীকে ছিনিয়ে নেওয়াই তার এখন লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। বিধবা নারী চন্দিকাকে সে যৌন চাহিদা চরিতার্থ করতে ব্যবহার করতো। ইংরেজদের চাকুরী ছেড়ে দিলেও তাদের আদর্শ, সংস্কৃতির প্রতি নটরাজ শ্রদ্ধাশীল ছিল। বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও বাঙ্গালী মেয়েকে সে ঘৃণা করে।

উপন্যাসের চতুর্থ অধ্যায়ে পুরন্দর সেনের পরিচয় পাই। সে কবিতা লেখে। সে মনে প্রাণে নীলিমাকে ভালোবাসে। এই ভালোবাসার আকর্ষণ তাকে নীলিমার বাড়িতে আসতে বাধ্য করেছিল। নীলিমার বাড়িতেই সুমিত্রার সঙ্গে তার পরিচয়। সুমিত্রা ও নীলিমার মাঝখানে পুরন্দরকে শ্যাওলার মতো ব্যক্তিত্বহীন বলে মনে হয়। নীলিমা ও পুরন্দরের গল্পের পটভূমিকায় ঢুকে নীলিমাকে সে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। ফলে পুরন্দরের প্রতি সুমিত্রার আকর্ষণও খানিকটা বেড়ে যায়। পুরন্দরের সঙ্গী বীরেন চক্রবর্ত্তী, ধীরাজ প্রসন্নকে নিয়ে নীলিমার বাড়িতে শুরু হয় সাহিত্য আড্ডা। এই আড্ডায় ধীরাজ চক্রবর্ত্তীর নির্দিষ্ট কোন মেয়ের প্রতি আসক্তি এই উপন্যাসে দেখা যায় না। সে কখনও শীলা, কখনও চন্দিকা, কখনও নীলিমার সঙ্গে গল্প করেছে। এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু ইংরেজ রাজত্বকালে ইংরাজী কালচারে প্রতিপালিত নর-নারীর প্রেমঘটিত দিকটি তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের শেষে চরিত্রগুলির মধ্যে কোন বিবাহের মধ্যে দিয়ে মিল দেখা যায় না। তারা যেন গল্প বলার জন্যই কোন হোটেলে বা পার্কে মিলিত

হয়েছে। উপন্যাসে পুরুষ অপেক্ষা নারী চরিত্রের সাবলীলতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় পাই। সুমিত্রা স্কুল শিক্ষিকা হয়েও তার মধ্যে লেখক অসমাঞ্জস্যভাবে যৌন সাড়ার উত্তেজনা উপন্যাসে দেখিয়েছেন।

নীলিমা পুরন্দরকে ভালোবাসলেও সুমিত্রার আবির্ভাবে সে প্রেম কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো, তার পরিণতি কি হল; তা উপন্যাসে দেখা যায় না। নীলিমার ছোট বোন শীলা চরিত্রের কোন ব্যক্তিত্ব উপন্যাসে ফুটে ওঠেনি। ইংরেজ রাজত্বকালেও চরিত্রগুলি যেন সকলেই সুখী। তারা স্বাধীনভাবেই প্রেম বিনিময় করেছে। এই উপন্যাসে নির্দিষ্ট কোন নারী বা পুরুষ প্রেম নিবেদন করে নি। এছাড়া উপন্যাসে মৃণালিনী বিবাহিত নারী হলেও সংসারে কোন বাধা বা নিয়মনীতি তার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। উপন্যাসে প্রত্যেকটি চরিত্রই যেন যৌবন তরঙ্গে কোথায় ভেসে চলেছে। উপন্যাসের শেষে আমরা দেখি প্রত্যেকটি পুরুষ ও নারী চরিত্রের রোমান্টিক আত্মভাবনায় চরিত্রগুলি বিভোর হয়ে চলাফেরা করছে।

"ধূসর গোধূলি" উপন্যাসটি ১৯৩৩ সালে রচিত হয়। প্রথম প্রকাশ ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। প্রকাশক ঃ জি.সি.সোম। ক্রাউন সাইজ, ৪+২৫২ পৃষ্ঠা, দাম ২ টাকা। "প্রগতি" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৫৮। এই সংস্করণ উক্ত পাব্লিসার্স করেছিলেন। মূল্য - চার টাকা। ক্রাউন সাইজ, ৪ + ২১৪ পৃষ্ঠা।

"ধূসর গোধূলি" উপন্যাসটি দশটি ক্রমিক সংখ্যায় বিভক্ত করা হয়েছে। স্বল্প সংখ্যক চরিত্রকে নিয়ে বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসের কাহিনী রচনা করেছেন। উপন্যাসের নায়ক নীলকণ্ঠ। লেখক যেন এই নীলকণ্ঠের জবানীতে কথা বলেছেন। নিজের জীবনকে নিয়ে সে সবসময় পরিক্ষা নিরীক্ষা করে চলেছে। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার বিরাম নাই। সমগ্র উপন্যাসে যেন কেউ আড়াল থেকে কাহিনী ধারা নিয়ন্ত্রণ করেছেন। এখানে লেখকের জবানীতে যেন নায়কের কথা পাই।

নীলকণ্ঠের কাকার মেয়ে অপর্ণা। অপর্ণার স্বামীর নাম কল্যাণকুমার। কল্যাণকুমারের একমাত্র বোন মায়া। অপর্ণার বাবা ব্রজমোহন উদার ও শিক্ষিত মানুষ। কল্যাণকুমারের বন্ধু হিসাবে বিনিয়েন্দ্র চরিত্রকে উপন্যাসে পাই।

আলোচ্য উপন্যাসটিতে লেখক বুদ্ধদেব বসু যুবক নীলকণ্ঠের মনের ভাব উচ্ছ্বাস, ও পারিবারিক কাহিনীকে ফুটিয়ে তুলেছেন। সে বয়সে কিশোর। সে সদ্য কলেজে ঢুকেছে। সে সারাক্ষণ বই এর মধ্যে ডুবে থাকতে চায়। সে শেক্সপীয়র, শেলী ও রবী-দ্রনাথের বই পড়তে ভালোবাসে। নীলকণ্ঠের কল্পনায় সবসময় এক স্ত্রী মূর্তি বেরিয়ে আসে, সে হল তার দিদি অপর্ণা। সে অপর্ণাকে পূজনীয় রূপে জ্ঞান করে। কিশোর বয়সে অপর্ণাদিকে দেবীত্বে প্রতিষ্ঠা করে সে ধন্য হয়েছিল। উপন্যাসে আরো জানা যায় অপর্ণা নীলুদের বাড়ি থাকত। মেয়ের বিয়ে দেবার উপক্রম হলে তার বাবা অপর্ণাকে নীলুদের বাড়িতে রেখে যায়। নীলু সবসময় অপর্ণার সৌন্দর্য্যকে লক্ষ করত। তারপর নীলের বাবার প্রিয় ছাত্র কল্যাণকুমারের সঙ্গে অপর্ণার বিয়ে হয়। কিন্তু তাদের এই বিয়ে বেশীদিন স্থায়ী থাকে নি। বিয়ের একমাসের মধ্যে কল্যাণকুমার এম.এ. পড়ার উদ্দেশ্যে বিদেশে চলে যায়। ঐ সময়ে অপর্ণার ভ্রূণ সন্তান নষ্ট হয়। এর তিন বছর পর কল্যাণকুমার ফিরে আসে। প্রতি মুহূর্তে কল্যাণকুমার অপর্ণাকে সন্দেহ করে। বিশেষ করে এই সন্দেহের তীর ছিল নীলের প্রতি। একদিন সে নীলকে বলেই বসে-"You have acad poetry, you are a poet. A poet. A uorshipper of goodesess. And I will kill you, I will kill you!" (বুঃবঃ রচনা সংগ্রহ- পৃঃ১০৭)। এই অবস্থায় তাদের সংসার জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। কল্যাণকুমারের স্থান হয় রাঁচীর হাসপাতালে এবং অপর্ণা মারা যায়। মরার আগে অপর্ণা নীলকে বলে গিয়েছিল "আমি জানি আমাকে তুমি খুব ভালোবাসো আমি মরে যাবার পরও এমনি করে তুমি আমায় মনে রাখবে"। এরই মাঝে নীলের সঙ্গে কল্যাণকুমারের বোন মায়ার সম্পর্ক তৈরী হয়। তারা পরস্পরকে ভালোবাসে। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে নীল ছিল ভীরু ও দুর্বল। শেষে মায়ার অন্যত্র বিয়ের ঘটনা উপন্যাসে দেখা যায়। এর প্রায় চল্লিশ বছর পরে নীলের চোখের অন্তরালে অপর্ণা দিদির ছবি ভেসে ওঠে।

"ধুসর গোধূলি" উপন্যাসে অপর্ণা ও কল্যাণকুমারের প্রেমের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত নীলকণ্ঠের নির্মোহ দৃষ্টি ধরা পড়েছে। কিন্তু কিশোর প্রেমের অংশীদার হিসাবে সে নিজে যথাযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে নি। নীরবে সে অপর্ণা ও কল্যাণকুমারের প্রেমের নিবিড়তা লক্ষ করেছে। কল্যাণকুমার এই উপন্যাসের একটি দুরন্ত চরিত্র। তার ইচ্ছাশক্তি প্রবল। নিজেকে নূতন করে দেখবার প্রয়োজন মনে করে নি। নিজের জীবনকে সে অন্যভাবে গ্রহণ করেছিল। অপর্ণাকে ভালোবেসেছিল ঠিকই কিন্তু তার

আকর্ষণ শক্তি তেমন ছিল না। নিজেকে সবসময় অবিশ্বাস করতো, নিজের মতকে স্থির সুস্পষ্ট ধারণায় কখনও এগিয়ে দেয় নি। কিন্তু তার মনের উচ্ছলতা অপর্ণা চরিত্রে নূতন মাত্রা এনে দিয়েছিল। অপর্ণা ছিল কল্যাণকুমারের বিপরীত মতাদর্শের মেয়ে। এই বিপরীত ধর্মী মেয়ে অপর্ণা কিভাবে কল্যাণকুমারের দ্বারা আকর্ষিত হয়েছিল তার সঠিক কোন ব্যাখ্যা উপন্যাসে পাওয়া যায় না। নীলকণ্ঠ তাদের নিয়ে যেন প্রেমের ভাষ্য রচনা করে চলেছেন। এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু নীলকণ্ঠের জবানীতে কথা বলেছেন। গভীর অনুভূতি ও মূল্যায়ন শক্তির মাধ্যমে উপন্যাসের নায়ক নায়িকাদের বুদ্ধদেব যেন বড়ো করে তুলেছেন। লেখককে সবসময়ে কল্যাণকুমারের প্রেমকে নিয়ে দ্বিধান্বিত হতে দেখা যায়। বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসের ব্যক্তি চরিত্রের গভীরতা দেখিয়েছেন। দুরন্ত এই জটিল আবর্তে কল্যাণকুমার ও অপর্ণার প্রেমকে বিকশিত হতে এবং নীলকণ্ঠ চরিত্রটির মধ্যে কোন জীবন্ত প্রতিফলন লক্ষ করা যায় না।

"ধূসর গোধূলি" উপন্যাসে কেবলমাত্র গভীর অনুভূতি ও মূল্যায়ন শক্তির মাধ্যমেই চরিত্রগুলি পরিস্ফুট হয়েছে। ব্যক্তি চরিত্রের নৈঃসর্গের আকাশে কেবল মাত্র ভাষার যাদুস্পর্শে চরিত্রগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যিকতার ঝোঁক অনেক বেশী প্রবল। বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের ভাষা থেকে আমরা জানতে পারি -

"অপর্ণা-দি, তুমি জলের মধ্যে জল, তুমি নদীর লাবণ্য; স্রোতের আনন্দ। আমার ভাবনার আকাশে ছবির পর ছবি ভেসে যায় - এই আমার এক জাগা রাত্রি, আমার অন্ধকার, আমার নির্জনতা আজ তোমাকে দিলাম, নাও হাত বাড়িয়ে নাও, একবার বলো যে ভুলে যাওনি।"- ৬

এই উপন্যাসটি বুদ্ধদেব বসুর প্রথম জীবনের রচনা হলেও এর মধ্যে চরিত্র ও গল্প রচনার মধ্যে নূতনত্ব এনেছিলেন। কারণ চরিত্রগুলি আদর্শ ও সততার সরণী বেয়ে উপন্যাসে একটা নূতন প্রাণের সঞ্চার করেছিল, যা বুদ্ধদেবের অন্য উপন্যাসের চরিত্রগুলিতে এভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায় না। এই উপন্যাসে অপার্থিব জ্ঞানের আত্মসুরভিত সৌন্দর্যের যে বর্ণনা পাই তা কল্পনাতীত। এইরূপ দেহস্থূলতাহীন ইঙ্গিত উপন্যাসে আলাদা মাত্রা এনেছে। উপন্যাসে বুদ্ধদেবের চরিত্র সৌন্দর্য্যের নিখুঁত পরিমিতিবোধ ও যথাযোগ্য বর্ণন কুশলতার দ্বারা আমাদের অনুভূতিকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে। কিন্তু এই অপূর্ব রূপ পরিকল্পনা তাঁর উপন্যাসের মধ্যে শেষের দিকে প্রত্যক্ষ

সমর্থন লাভ করে নি। কল্পনা জগৎ থেকে কর্ম জগতে উত্তরণ ঘটাতে গিয়ে যেন ম্লান হয়ে গিয়েছে। এছাড়া দাম্পত্য সম্পর্ক ও পরিবারের অন্যান্য সকলের সঙ্গে ব্যবহারে এই উপন্যাসে নারীর গভীরতার পরিচয় পাই। চরিত্রগুলির মধ্যে স্পর্শভীরু ও রমণীয়তা বুদ্ধদেব বসুর কল্পনার সুদূর উদ্দেশ্যময় চিন্তাশক্তির প্রতিফলনও লক্ষ করা যায়। কিন্তু বাস্তব জগতে সংঘাতময় পরিবেশ অপেক্ষা অসহায় নিষ্ক্রিয়তাই অধিক ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে। চরিত্র গুলির সুকুমার কল্পনার রঙ্গীন পাখা বিস্তৃত হতে যতটা দেখা যায় বাস্তবের রূঢ় মাটিতে তাদের ততটা সাবলীল হতে দেখা যায় না।

নীলকণ্ঠের জীবন সমীক্ষার যে পরিচয় উপন্যাসে পাই, তার সক্রিয়তা উপন্যাসে লক্ষ্য করার মত। নীলকণ্ঠ ও অপর্ণার মায়াময় সম্পর্কের যে প্রশস্তি রচনা হয়েছে, জীবনে তার কোন প্রতিফলন দেখি না। সে বরাবর অপর্ণাকে বালিকা বলে গেছে। অপর্ণা ও কল্যাণকুমারের প্রেমের উন্মেষ বাস্তব বোধহীন, মনে কোন গভীর রেখাপাত করেছে বলে মনে হয় না। উপন্যাসের আরেকটি চরিত্র মায়ার সঙ্গে তার সদ্য বিকশিত প্রণয় মোহ অন্ততঃ চারদিক হতে সক্রিয়ভাবে সাড়া ফেলেছে। এই কিশোর প্রেমের কোন বিশেষত্ব আমরা এই উপন্যাসে দেখি না। অপর্ণার অপার্থিব মোহময় প্রকৃতি বৈশিষ্ট্যের প্রতি নিমগ্ন হওয়ার জন্য নায়ক কিশোরসুলভ সাধারণ আকর্ষণ তার মানস চেতনায় ফুটে উঠেছে। নীলকণ্ঠের এই ভাব উপন্যাসে যেভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তাদের সাধারণ অনুভূতির কোন তীক্ষ্ণ গ্রহণশীলতা আমরা দেখি না। উপন্যাসে সে উপেক্ষিত, আত্মসম্মানহীন ছেলেমানুষ- এমনকি, ব্যর্থ প্রেমিক রূপে তার ব্যক্তিত্ব দীপ্ত হয়ে ওঠে নি। ভূমিকায় উপন্যাসের বহু ঘটনার মধ্যে তার গভীর অনুভূতি ও মূল্যায়ন শক্তি ফুটে উঠেছে কিনা উপন্যাসে তার কোন সমাধান পাওয়া যায় না।

কল্যাণকুমার চরিত্রটি উপন্যাসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সজীব ও সক্রিয় চরিত্র, কিন্তু বুদ্ধদেব তাঁর বিশিষ্টতাকে ও সজীবতাকে উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রে প্রতিফলিত না করে হঠাৎ যেন ছেদ টেনেছেন। তবু বুদ্ধদেব বসুর প্রথম জীবনের উপন্যাসে যে চরিত্র ও আবহাওয়া পরিকল্পনার পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। এই উপন্যাসটি সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন -

"অপর্ণার অপার্থিব ব্যঞ্জনাময়, আত্মসুরভিত সৌন্দর্যের যে বর্ণনা পাই তাহা কল্পনার দিক দিয়া বাস্তবিকেই অপূর্ব।" - ৭

"সানন্দা" উপন্যাসটি ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে "পরিচয়" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক - ডি.এম. লাইব্রেরী, শ্রী গুরুদাশ চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স। উৎসর্গ ঃ পরিমল মিত্রকে। দাম - ৪ টাকা।

"সানন্দা" উপন্যাসের পরিকল্পনার মধ্যে বুদ্ধদেব বসুর চরিত্র পরিকল্পনার মৌলিকতা লক্ষ করা গেলেও উপন্যাসের সূত্রপাত থেকে অন্তিম পর্যায় পর্যন্ত ঘটনা বিন্যাসের খাম-খেয়ালিপনা লক্ষ করা যায়। কবি উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের জবানীতে বুদ্ধদেব বসু কথা বলেছেন। সানন্দার আচরণের মধ্যে চরিত্র পরিকল্পনা বিশেষ কোন বার্তা বহন করে আনে নি। আবার তার আচরণ এবং কথাবার্তার মধ্যে সংহতির অভাব লক্ষ করা যায়। দেহজ আকর্ষণ ও কামনার বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে ধরা পড়েছে। লেখক নিঝুম পরিবেশে সানন্দাকে নিয়ে অনুভব করেছেন -

"অন্ধকারের অসীম রহস্য, সানন্দা বলতে লাগল, গোপন কথার ভারে সমস্ত আকাশ যেন গম্ভীর হয়ে আছে। এক রুদ্ধ আবেগে তারাগুলো থর থর করে কাঁপছে। তোমার তাই মনে হয় না। সানন্দা মুখ ফেরাতেই আমার গালের সঙ্গে ওর মাথার ঘষা লেগে গেলো।" - ৮

এই উপন্যাসের মধ্যে বাছাই সংলাপে কল্লোলীয় চেতনার আভাস দেখা যায়। এই উপন্যাসে লেখকের উদ্দেশ্য ছিল ঐতিহাসিক সত্যকে শ্রেণি সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর ঐ ভাবনা পুরোপুরি পাওয়া না গেলেও উপন্যাসে যা পাওয়া গেল তার মূল্যও কম নয়। সানন্দা উপন্যাসের মধ্যে সমাজ এবং সময়ের ছবি কোন ভাবেই খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে ব্যক্তি চরিত্র হিসাবে সানন্দা দুর্বল রক্তহীন, সম্পর্কহীনতায় কোন ভাবেই দাঁড়াতে পারে নি।

"একদা তুমি প্রিয়ে" উপন্যাসটি ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রচিত হয় এবং ঐ বছরের মে মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরিমার্জিত নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয় জুলাই ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে। ক্রাউন সাইজ, ২+১৪৫ পৃষ্ঠা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩ বঙ্কিমচন্দ্র স্ট্রীট, কোলকাতা-৯।

এই উপন্যাসটি সংস্করণে অনেক পরিমার্জনা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, উপন্যাসটির এই পরিমার্জনার ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অংশই বাদ গিয়েছিল বলে অনেক সমালোচক মনে করেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসকে কাব্যধর্মী উপন্যাস বলেছেন। এই উপন্যাসে জীবনের বিশেষ মুহূর্তগুলিকে কাব্যানুপ্রেরিত বলে মনে হয়। এই উপন্যাসের কাহিনীকে বুদ্ধদেব বসু সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদ আটটি, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সাতটি, তৃতীয় পরিচ্ছেদ চারটি, চতুর্থ পরিচ্ছেদ তিনটি, পঞ্চম পরিচ্ছেদ দুইটি, ষষ্ট পরিচ্ছেদ তিনটি ও সপ্তম পরিচ্ছেদ চারটি ক্রমিক সংখ্যায় বিভক্ত করা হয়েছে। এই উপন্যাসে পলাশের পরিবারকে দেখা যায়। পলাশ উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র। তার বাবা ও দাদা বড় চাকুরি করে, বোন লাবণ্য মেয়ে কলেজের প্রিন্সিপাল। এই অভিজাত পারিবারিক বলয়ের মধ্যে পলাশ বড় হয়েছিল। পলাশ নিজের জীবন সম্পর্কে উদাসীন। তার এই আলস্যময় জীবন সম্পর্কে বাড়ির সকলেই চিন্তিত ছিল। সে বিলাসিতার মধ্যে দিয়েই জীবনকে উপভোগ করতে চেয়েছিল। তার বান্ধবী রেবা ঘোষ। সে বিদ্যালয়ের সহ-প্রধান শিক্ষিকা। কলেজ জীবনে তারা পরস্পরকে ভালোবাসত। তাদের এই ভালোবাসার বয়স প্রায় তিন বৎসর, কিন্তু কোন অজানা কারণে তাদের এই ভালোবাসায় ছেদ পড়েছিল। এই বিচ্ছেদের বয়সও প্রায় দুই বৎসর। কোনরকম প্রতিবাদ বা অশালীন কাজকর্মের জন্য তাদের এই সম্পর্কে ছেদ পড়েনি বলে লেখক জানিয়েছেন। কিন্তু প্রায় দুই বৎসর পরে পলাশ মনের টানে রেবার কাছে রেলগাড়িতে চেপে দেখা করতে চলেছে। চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য পলাশকে পূর্বের স্মৃতি কিছুটা মনে করিয়ে দেয়। পলাশ ভাবে - রেবাকে সে একদিন ভালোবেসেছিল, এখন তাকে কেমন করে শুভেচ্ছা জানাবে - এ নিয়ে সে চিন্তিত। পলাশ রেবার সঙ্গে পুরোনো সম্পর্ককে পুনরুদ্ধার করার সংকল্প নিয়েছিল। সে সিদ্ধান্ত নিল সে যে করেই হোক রেবার কাছে তার করুণ হৃদয়ের কথা বুঝিয়ে বলবে। কিন্তু রেবা এখন আর পলাশকে ভালোবাসে না। এইভাবে পলাশ নিজেকে সহজ করে রেবার বাড়িতে কিছুদিন কাটাল। এখানে বুদ্ধদেব বসু আরেকটি চরিত্রকে এনে পলাশের প্রেমকে বিভাজন করেছিলেন। পলাশের প্রেম যেন কোন মোহনা দিয়ে আরেকটি সাগরে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। এ প্রেমের মোহনারূপী মেয়েটির নাম প্রতিমা। প্রতিমা, রেবার পুরোনো ছাত্রী। তার অত্যন্ত কৈশোর বয়স। তার মন কৌতূহলী চঞ্চলা পাখির ন্যায় উন্মিলিত। প্রতিমা যেন চৈত্রের শুকনো পাতার মতো এলোমেলো। সে প্রতিদিন রেবার কাছে গোলাপ ফুল নিয়ে আসত। সে রেবাকে খুব শ্রদ্ধা করে এবং তার সঙ্গে সময় কাটাতে ভালোবাসে। রেবাও প্রতিমাকে স্নেহ করে। নানা গল্পের মধ্যে দিয়ে রেবার সঙ্গে সম্পর্কটা অনেকটা বান্ধবীর মতো।

প্রতিমা, রেবার সঙ্গে পলাশের বিষাদঘন প্রেমের ব্যাপারটি অনুধাবন করে। রেবার অজান্তে প্রতিমা ও পলাশের সম্পর্কটি গভীরতর হয়। প্রতিমা ফুলের তোড়া দিয়ে পলাশকে শুভেচ্ছা জানায়। প্রতিমা লজ্জার আড়াল থেকে যেন পলাশকে প্রেম নিবেদন করে। এমনি করে প্রতিমার সংস্পর্শে পলাশ তার মনের অন্তরালে একটি নূতন জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। প্রতিমার বলা বিভিন্ন কথা তার মনে প্রেমের উন্মেষ ঘটিয়েছিল। কিন্তু এখানেও পলাশের মধ্যে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব কাজ করেছিল। রেবা এবং প্রতিমা তার হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছিল। প্রতিমা ঠিক বুঝতে পেরেছিল পলাশের মনের ছবি। এখানে রেবার মানসিক অবস্থার বিবরণ লেখক তুলে ধরেন নি। লেখক প্রতিমার মধ্যে রেবার স্নেহের স্মৃতি এনে উপন্যাসের হঠাৎ সমাপ্তি টেনেছেন। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় পলাশ এই পরিস্থিতিতে সব মোহ, বাধা অতিক্রম করে দুজনকেই রেখে নিজগৃহে ফিরে যায়। তার মনে প্রশ্ন জাগে "অন্য কোন পুরুষ কি করত - এই অবস্থায়"? তবু যেতে যেতে পলাশের মনে হয় "গোলাপের তোড়াটা কেন ছুটে চলেছে তার জামা কাপড়ের বাক্সের মধ্যে ? তা নিয়ে সে কি করবে ?" (পৃঃ-২০৪)। এই উপন্যাসে পলাশ চরিত্রের কোন আলাদা ব্যক্তিত্ব আমরা দেখতে পাই না। উপন্যাসের চূড়ান্ত পরিণতি বিরহের মধ্যেই থেকে গেছে। রেবার মধ্যে প্রেমের গভীরতা লক্ষ করা যায় না। প্রতিমা চরিত্রটি এই উপন্যাসে আলাদা কোন তাৎপর্য এনেছিল বলে মনে হয় না। দুটি নারী চরিত্রের মাঝে লেখক পলাশ চরিত্রটির অসহায়তার দিকগুলি যেন তুলে ধরেছেন।

"অসূর্য্যস্পশ্যা" উপন্যাসটি ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় এবং ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, প্রকাশক- আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, মুদ্রণ, প্রিন্ট ও গ্রাফ, ৯ সি, ভবানী দত্ত লেন, কোলকাতা-৭৩।

"অসূর্য্যস্পশ্যা" উপন্যাসে কেন্দ্রিয় চরিত্র হিসাবে সরমাকে পাই। সরমার জীবনের ঘাত প্রতিঘাত উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন। দার্জিলিং এর কুয়াশা ঘেরা প্রকৃতির মধ্যে সরমার প্রেমের রূপ লেখক অঙ্কন করেছেন। লেখক নির্জনতা ও নীরবতার মধ্যে দিয়ে সরমার চরিত্রের বিকাশ ঘটিয়েছেন। একমাত্র প্রকৃতি তার চারিত্রিক বিকাশে যেন সাহায্য করেছে। অন্ধকার নির্জন পর্বতঘেরা যে মন্দির দার্জিলিং এ লেখক দেখেছিলেন সেই পেক্ষাপটকেই তিনি সরমার জীবনে স্থায়ী রূপ দিলেন। সরমার জীবনে যে নূতন বাঁক নিয়েছিল তা অনেকটা রহস্যময়ভাবে লেখক অঙ্কন

করেছেন। তার প্রেমের ভয়াবহ রূপ এখানে প্রকাশিত হয় না। উপন্যাসে বাস্তবতা চরিত্রের সঙ্গে ততটা সম্পর্ক রাখেনি। একটা সাংকেতিকতার গীতিকাব্যচিত অনুভূতির পরিচয় লেখক এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন। পর্বত বেষ্টিত প্রকৃতি আত্মসচেতন ভাবে প্রেমের পূর্ব স্মৃতি যেন বহন করে চলেছে। প্রেমের দুরন্ত উত্তাপের পরিবর্তে একটা শীতল ও নীরব অনুভূতিতে সরমা চরিত্রের অর্ন্তদ্বন্দ্বের বিভিন্ন রূপ লেখক তুলে ধরেছেন। এছাড়া উপন্যাসে কৈশোরের স্বতস্ফূর্ত লীলাময়তার চঞ্চল রূপ কিছুটা দেখা যায়।

"সূর্য্যমুখী" উপন্যাসটির রচনা কাল ১৯৩৪ সাল। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালের মে মাসে। ক্রাউন সাইজ ৮+১৬৪ পৃষ্ঠা। মূল্য - দেড়টাকা। প্রথম সংস্করণের মতো দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশক - শ্রীগুরু লাইব্রেরীর পক্ষে প্রভাস চন্দ্র মজুমদার।

উপন্যাসটি ১২টি খন্ডে বিভক্ত। উপন্যাসের প্রথমেই দেখি হৈমন্তীর পরিবার। হৈমন্তী বিধবা, বয়স আটত্রিশ। হৈমন্তীর ছেলে মিহির। মিহির বিবাহিত। তার বিয়ে দিয়েই উপন্যাসটি শুরু হয়েছে। মিহির ছিল মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। মিহির তার সাহিত্যিক বন্ধুদের সকলকে ফাঁকি দিয়ে বিয়ে করেছিল। বন্ধুদের সাহিত্য লেখায় মিহির ছিল তাদের প্রেরণাদাতা। বাংলা কবিতাকে মিহির নূতন রাস্তায় নিয়ে গিয়েছিল। নিজেকে সে গরীব ও বড় লেখক বলে ভাবতে শেখে নি। সে ছিল আবেগপ্রবণ। তার ভাবনা ও মূল্যবোধ তার কাছে চূড়ান্ত সত্য। বিধবা মায়ের স্নেহ ধারায় সে পল্লবিত হয়েছিল। মাকে ঘিরেই তার জীবন। মিহিরের আরামের জীবন, খাওয়া থেকে পোষাক এমন কিছুতেই তার অভাব নেই যাতে সে অশান্তি ভোগ করে। এই সুখ পিয়াসী মিহিরের বিয়ে হলো গরীব ঘরের মেয়ে মৃণালের সঙ্গে। বিয়ের পর থেকে দাম্পত্য জীবনে সে মধুরতা আনতে পারে নি। তার ও মৃণালের মধ্যে তর্ক চলতো দিন-রাত। মিহিরের মা গোপনে তাদের মেলামেশার ঘাটতি অনুভব করেছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের সম্পর্ক চিরস্থায়ী হয় নি।

এই উপন্যাসে মিহিরের দাম্পত্য জীবনের জটিল মনোস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের পরিচয় পাই। তার স্ত্রীর নাম মৃণাল। হৈমন্তীর ইচ্ছাতেই মৃণালের সঙ্গে মিহিরের বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পরও সাংসারিক জীবনের ভার হৈমন্তী সব সময় নিজের কাঁধে বহন করেছিল। কখনও ছেলেকে সংসারের হিসাবের মধ্যে সে রাখে নি। ছেলের সাহিত্য রচনায় যেন কোন ব্যাঘাত না ঘটে সেইজন্য আহার থেকে সমস্ত কিছুতে হৈমন্তী স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ

যোগান দিত। কিন্তু একদিন হৈমন্তী বয়সের ভারে ছেলেকে সাংসারিক হওয়ার পরামর্শ দেয়। কিন্তু মিহিরের মধ্যে তার সাহিত্য জগৎ থেকে সাংসারিক হবার অভিপ্রায় দেখা যায় না। কারণ হৈমন্তী একদিন নিজের পছন্দ করা পাত্রীর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়েছিল। মিহির মার কথা ভেবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মৃণালের সঙ্গে বিয়েতে রাজী হয়ে যায়। এ ব্যাপারে হৈমন্তী ছেলে ও পুত্রবধূকে বিভিন্ন উপদেশের ত্রুটি রাখে নি। কিন্তু তার এই চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ স্ত্রীর প্রতি ছেলের ব্যবহার লক্ষ করে হৈমন্তীকে একদিন ভাবতে হয়, বুঝি সে ভুল করেছিল। পুত্রবধূর মধ্যে সে কোন দোষ পায় নি। এখানে বুদ্ধদেব বসু মিহিরকে শুধু সাহিত্যিক জীবনের গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। তাই এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মিহিরের মধ্যে কোন ভাবান্তর লক্ষ করা যায় না। সে একজন সাহিত্যিক, কবি ও আর্টিষ্ট হিসেবে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই গৌরব ও পদমর্যাদা, ভাবনা ও তার মূল্যবোধ- এ সব কিছুই তার সংসার জীবনে কোন কাজে লাগে নি। মিহির সবসময় ভাবতো সংসারের সময় নষ্ট করার চাইতে সাহিত্যের কয়েকটি লাইন লিখে ফেলতে পারলে সেটাই তার পরম ঐশ্বর্য্য। মিহির পরিপূর্ণ আত্মভোলা, উদাসীন ধরনের মানুষ। সে নিজের জীবন নিয়ে একা থাকতে ভালোবাসত। সে ছিল আরামের মানুষ, আর এর জন্য দায়ী ছিল তার মায়ের স্নেহ। স্ত্রী ছিল মিহিরের জীবনের চরম অনীহা, তার জীবনে স্ত্রীর প্রবেশ একেবারে অবান্তর, নিছক বাহুল্যও বটে। উত্তাপহীন ও আনন্দহীন হয়ে বিয়ে করলেও স্ত্রীর সঙ্গে সে কোনরকম সম্পর্ক তৈরী করে নি। স্ত্রীর প্রতি তার প্রতিক্রিয়া যেন খানিকটা শারীরিক বিকর্ষণ গোছের। যদিও স্ত্রী লোকের প্রতি প্রত্যেক কবি যতটা দুর্বল থাকে, মিহির সে ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, স্ত্রীর প্রতি তার ছিল অনতিক্রম বিমুখতা ও উদাসীনতা। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে মিহিরকে তার আত্মার কোনখানেই স্থান দেয় নি। ফলে মিহির ও মৃণালের দাম্পত্য জীবনের প্রকৃত সুখ ছিল না ঠিকই, কিন্তু তাদের জৈবিক সংস্পর্শ ছিল না এ কথা বলা যায় না। কারণ উপন্যাসের শেষে মৃণাল পেয়েছিল মাতৃত্ব। এটুকুই ছিল নারী হিসাবে মৃণালের সান্ত্বনা। এছাড়া প্রতি মুহূর্তে মিহিরের কাছ থেকে মৃণাল শুধু পেয়েছিল নিষ্ঠুরতা। কিন্তু মিহিরকে সারা জীবন স্ত্রীর সঙ্গ লাভ করতে হয় নি। অকাল মৃত্যুতে তার স্ত্রী তাকে মুক্তি দিয়ে গেছে। তাই মৃণালের জীবন ছিল কানায় কানায় ভরা দীঘির কালো জলের মতো এবং মিহির ছিল তার কাছে দীঘির কালো জলে ছায়া মাত্র। মৃণাল তাকে কল্পনায় ধরতে চাইলেও বাস্তবে সে ছিল অনেক দূরে। সত্যিকারের ভালোবাসা সে কখনও তার স্বামীর কাছে পায় নি। আর এর জন্য তার স্বামীর কাছে সে কখনও নালিশ জানায় নি। যেমনটা তার স্বামী চেয়েছে সেভাবেই মৃণাল

নির্লিপ্ততার জগতে বাস করেছে। সে শুধু স্থির দৃষ্টিতে তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকত। তার মধ্যে কখনও প্রতিবাদের সুর উঠতে দেখা যায় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও মৃণাল যখন সন্তান সম্ভবা হবার মুহূর্ত সে সময় সে আস্তে আস্তে নিজেকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এক সন্তান জন্ম দিয়ে সে প্রাণ ত্যাগ করে। কিন্তু মরার আগে একবার তার স্বামীকে একটি কথাই বলেছিল - "কেন তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে ? তুমি কি কখনও আমাকে এতটুকু ভালোবাসতে পারবে না ?" মিহির এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারে নি। এই উপন্যাসে আরেকটি গৌণ চরিত্র তাপসীকে এনে মিহিরের দেহ কামনার উচ্ছ্বাসকে লেখক তুলে ধরেছেন। তাপসী ছিল একটি পত্রিকার সম্পাদক। কবিতা ছাপানোর মধ্যে দিয়ে তাদের দেহ কামনার দিকটি উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। কিন্তু যখনই তাপসী তার স্ত্রীর এই দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর কথা শুনেছিল তখন সে নিজেকে সরিয়ে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু মিহিরের এই উদাসীন জীবনকে ফিরিয়ে আনতে তাপসী তাকে আপন করে নিয়েছিল।

"পরস্পর" উপন্যাসটি রচিত হয় ১৯৩২-৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। অক্টোবর, ১৯৩৪ সনে ডি.এম লাইব্রেরী দ্বারা এই উপন্যাসটি প্রথম বই আকারে প্রকাশিত হয়। এই বইটির পরে আর কোন সংস্করণ হয় নি। উপন্যাসের শেষের পরিচ্ছেদ ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে লেখা। বাকী অনুচ্ছেদগুলি ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে লেখা হয়েছিল। বই এর প্রচ্ছদ সজ্জা শ্রী অনিল কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের করা।

"পরস্পর" উপন্যাসটি ৮ টি পরিচ্ছেদে লেখা হয়েছে। এই উপন্যাসের নায়ক অশান্ত রাত্রির অন্ধকারে, নিজস্ব জগতে বসে ছিল। নায়ক এবং নায়িকা ভাবনার জালে পরস্পর জড়িয়ে পড়েছিল। দুটো ঘরে দুটো প্রাণ যেন আলাদা ভাবে ভাবতে গিয়ে অন্য জগতে চলে যায়। এই ভাবনার পরিচয় পাই -

"- যে ভাবনা ব্যক্তি ভাবনার বাইরে কিছুতেই যেতে পারলো না। তারপর আর কিছুই রইল না, কোন আকাশ, কোন পৃথিবী, কোন অনুভূতি কিছুই রইল না। শুধু চিরন্তন রাত্রি আর রক্তের সমুদ্রের নিঃসীম অন্ধকার।" - ৯

বুদ্ধদেব বসুর এই উপন্যাসে সাহিত্য-ভাবনার দিকটাকে যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আসলে বুদ্ধদেব এই উপন্যাসে ইনটেলেকটের চাইতে ইনট্যুইশন বেশী

দেখাতে চেয়েছেন। আধুনিক জীবনের জটিল পট পরিবেশ, সমকালীন কল্লোলীয় সাহিত্য বিতর্ক থেকে তার উপন্যাসে এসেছে আলাদা বিশ্লেষণী শক্তি। এই মানসিকতা ইংরাজী উপন্যাস থেকে এসেছিল বলা যেতে পারে। লেখক যেন নিজের ভাবুকী স্বভাবের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের সব চরিত্রকে অর্ন্তমুখী করে তুলেছিলেন।

এই উপন্যাসে বাসন্তীর পরিবারের ঘটনা বুদ্ধদেব বসু তুলে ধরেছেন। বাসন্তীর এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে সংসার। ছেলের নাম অশান্ত ও মেয়ের নাম মালতী। এ ছাড়া এই উপন্যাসে অশান্তের বন্ধু বিমল, লতা ও রাণীকে দেখা যায়। অশান্তের ডাক নাম শান্ত। বুদ্ধদেব বসু এই শান্ত চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের মূল থীমকে দাঁড় করিয়েছেন। শান্ত ভীরু, দুর্বল ও প্রতিবাদহীন স্বভাবের ছেলে। সকলকেই সে ভালোবাসতে চায়। কিন্তু গভীরতর সম্পর্ক স্থাপনে সে রাজী নয়। শান্তের ছোট বোনের নাম মালতী। ছোট থেকে সে মায়ের সান্নিধ্যে থেকেছে। মালতী শান্তের থেকে দেড় বছরের ছোট। মালতী ও শান্ত দুজনেই বাবার ভালোবাসা কখনও পায় নি। বাবাকে তারা ভয় ও অবিশ্বাসের চোখে দেখতো - সাধারণতঃ কখনো তার কাছে যেত না। লেখকের দৃষ্টিতে তাদের বাবা নিরীহ গোছের বনমানুষ বলে মনে হয়েছিল।

বাল্যকাল থেকেই শান্ত অবসর সময়ে কবিতা পড়তে ভালোবাসত। এছাড়া সাহিত্য সমালোচনা তার কাছে বেশ পছন্দের ছিল। এই কিশোর বয়সে শান্ত কাগজের অফিসে কাজ নিয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই সে একটি পত্রিকার সম্পাদনার মধ্যে দিয়ে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। শান্ত মালতীর চেয়ে দেড় বছরের ছোট হলেও মালতীর বিয়ের দায়িত্ব তার কাঁধেই পড়েছিল। শান্তর অফিসের এক অডিটর বন্ধু বিমলকে পাত্র হিসাবে তার বোনের জন্য পছন্দ করে। এ প্রসঙ্গে আরেকটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শান্তর নিজের জীবনে প্রেম তেমন করে আসে নি। তবু তার জীবনে দুজন মেয়ের অবস্থান ছিল। একজন লতা এবং অপর জন রাণী। লতাকে শান্ত চোখে দেখে ভালোবেসেছিল, লতাও শান্তকে গভীরভাবে অনুভব করত। এদিকে কলেজের বন্ধু বিকাশের দৌলতে সে লতার সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করে। কিন্তু চাক্ষুষ দর্শনের পর লতার প্রতি তার আকর্ষণ আর তেমন দেখা যায় না। তবু সময় কাটানোর জন্য লতার অনুরোধেই সে মেলামেশা করত। উপন্যাসের পঞ্চম খণ্ডে লতাকেও তেমনভাবে শান্তের প্রতি আর আকর্ষিত হতে দেখা যায় না। লতা মনে করে শান্তর সঙ্গে যতটুকু সম্পর্ক, তা সাময়িক। যতদিন না শান্তর প্রতি আকর্ষণ ক্লান্ত হয়ে আসে ততদিন একটা হালকাভাবে

অবসর বিনোদন ছাড়া আর কিছুই নয়। উপন্যাসের ষষ্ঠ খণ্ডে শান্তর জীবনে লতাকে কবিতার প্রতিমূর্তি রূপে আমরা দেখতে পাই। তাই সে লতা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল। এর পরই শান্তের জীবনে রাণী নামে একটি মেয়ের প্রবেশ ঘটে। রাণী ছিল শান্তর মা বাসন্তীর বান্ধবীর মেয়ে। রাণী একজন স্কুল শিক্ষিকা। রাণীকে দেখে শান্ত গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়। এতদিন লতার উদ্দেশ্যে শান্তর মনে হত - "সময় টা কেটে যেতে দিই !" কিন্তু রাণী তার জীবনে আসার পর মাঝে মাঝে রাণীর অনুপস্থিতিতে শান্ত বুঝতে পারল - "ভালোবাসা জিনিসটা কি ?" এই অসীম শূন্যতার মাঝে মুহূর্তের জন্য একটি নূতন চেতনা ফিরিয়ে এনেছিল রাণী। উপন্যাসের শেষের দিকে আমরা দেখি রাণী শান্তের বাড়িতেই থেকে যায়।

উপন্যাসের শেষে আমরা দেখতে পাই শান্ত ও মালতী দুজনেরই ছিল প্রেমের প্রতি অসহিষ্ণুতার মনোভাব কিন্তু তারা পরস্পর সঙ্গী ও সঙ্গিনী পাওয়ার পর তাদের এই মনের ভাবনা আস্তে আস্তে চলে যায়। স্বামী-স্ত্রীর গভীর সম্পর্ককে তারা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে শেখে।

বুদ্ধদেব বসু "অনেকরকম" উপন্যাসটি ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন। প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। প্রকাশক দেবসাহিত্য-কুটীর (২১/১) বরানগর লেন, কোলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে। প্রকাশক ঐ একই। এই সংস্করণে উপন্যাসটি পরিমার্জিত ও রূপান্তরিত হয়ে "ক্ষণিকের বন্ধু" নামে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটিকে একটি নাট্যোপন্যাসও বলা যায়। উপন্যাসটি "পরিচয়" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

"অনেক রকম" উপন্যাসটি ছয়টি খণ্ডে বিভক্ত। বালিগঞ্জের একটি ছেলে ও মেয়ের কথোপকথন দিয়ে উপন্যাসটি শুরু হয়েছে। এরা ভাই-বোন। ভাই এর নাম মুকুল ও বোনের নাম বুবুন। উপন্যাসে আরো তিনটি পুরুষ চরিত্র আছে - পূর্ণেন্দু, কিঙ্করী, কিউকন রায় (কিকির), অকরুণবাবু, অনুরূপবাবু। নারী চরিত্র হিসাবে পাই লতা, অরুণা ও আয়নাকে। আয়নাকে ভালোবাসে মুকুল। এই ভালোবাসা প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যে দেখা যায়। ভালোবাসা গড়ার কাজে মুকুল, বকুল লতাকে পরস্পরকে সাহায্য করেছিল। আয়না, মুকুলের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ভালোবাসার প্রস্তাব ও প্রত্যাখ্যান এই নিয়ে উপন্যাসে যেন একটা অস্থিরতার সৃষ্টি করে। কোন চরিত্রের মধ্যেই

ভালোবাসার নিবিড়তা লক্ষ করা যায় না। তারা যেন একটি সাহিত্যের আসরে মিলিত হয়ে বিভিন্ন চরিত্রের প্রেম সম্পর্কের ধারণায় বক্তব্য রেখেছে মাত্র। তাদের মিলনের দৃশ্য উপন্যাসে নেই। ক্ষণিকের বন্ধুত্বের পরিচয়ে তারা যেন উপন্যাসে এসেছিল। উপন্যাসে বুদ্ধদেব কোন চরিত্রের পরিপূর্ণতা দেখান নি। বুদ্ধদেব বসু একটি সজীব চরিত্র পূর্ণেন্দুর মধ্যে দিয়ে আদর্শবাদের কিছু কথা বলতে চেয়েছেন। পুর্ণেন্দু পঁয়ত্রিশ বছরের এক যুবক অধ্যাপক। আবার আয়না চরিত্রে লেখক ব্যক্তিত্বের ছাপ রেখেছেন। সে নিজের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জীবন কাটিয়েছে। ভালোবাসার পর্যায়ক্রমিক স্থিরতা ও কৌতূহল এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু বর্জন করেছেন। এই উপন্যাসে একটা অসার্থক প্রেমের গল্প বলা জবানীতে বহু চরিত্র নিজের মতামত প্রকাশ করছে মাত্র। উপন্যাসে কোন গতি লক্ষ করা যায় না। ঘটনার কোন ক্রমবিকাশ উপন্যাসে নেই।

খ) দাম্পত্য জীবন ও বিবাহোত্তর প্রেমের উপন্যাস ঃ

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের একটি প্রিয় বিষয় ছিল দাম্পত্য জীবন ও বিবাহোত্তর প্রেম। তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে এই থীমটিকে তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। "লাল মেঘ", "কালো হাওয়া", "রূপালি পাখি" এই উপন্যাসগুলিতে আমরা এই থীমকে বাস্তবায়িত হতে দেখি। এই বিষয় পর্বের উপন্যাসে প্রেমের দেহজ কামনায় চরিত্রগুলি আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। তবে এই দাম্পত্য জীবন উপন্যাসে দেহ সর্বস্বতায় পর্যবসিত হয় নি। দেহকে ঘিরে উপন্যাসের নরনারীরা ভুলে গেছে যে তারা বিবাহিত। বুদ্ধদেবের উপন্যাসে অনুশাসনহীন দাম্পত্য জীবনে নরনারীরা বাস করছে। বুদ্ধদেব এই সমাজে নিরপেক্ষভাবে নর নারীর চরিত্রে বিভিন্ন প্রেমের প্রসঙ্গ এনেছেন, যা নাগরিক জীবনের পক্ষে ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ।

"লালমেঘ" উপন্যাসটি রচিত হয় ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। "পরিচয়" পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ঃ শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স। ক্রাউন সাইজ, পৃ ঃ- ৬ + ২৫০, পরিমার্জিত নূতন সংস্করণ - সেপ্টেম্বর ১৯৪৬।

এক বছরে বুদ্ধদেব বসুর যে পাঁচটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল, "লালমেঘ" তাঁরই মধ্যে একটি। লালমেঘ উপন্যাসটিকে লেখক পাঁচটি ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে, পাঁচটি পর্বে ভাগ করেছেন।এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র অবিনাশ রায় ও তাঁর স্ত্রী শোভনা রায়।

এই দুটি চরিত্রের মাঝখানে তৃতীয় চরিত্র হিসাবে সন্ধ্যামণিকে দেখি। অবিনাশ ও শোভনা রায়ের এক দাম্পত্য জীবনের বিবরণ লেখক উপন্যাসের প্রথমে তুলে ধরেছেন। তারা অর্থপূর্ণ অভিজাত পরিবারের মানুষ, কিন্তু তাদের পরিবারে সুখ ছিল না। এই পরিবারের বিবরণ দেবার আগে তাদের সম্পর্কের দিকটা জেনে নেওয়া দরকার। উপন্যাসের প্রথমে আমরা অবিনাশকে রুচিশীল ভদ্রলোক হিসাবে দেখি। শোভনা রায় বিখ্যাত তারিণীচরণ ঘোষের তৃতীয় কন্যা। অবিনাশ ও শোভনা বিয়ের দেড় বছর দিনাজপুরে শ্বশুরবাড়িতে থাকার পর রোগাক্রান্ত হয়। দীর্ঘদিন ধরে শোভনা রোগে ভুগতে থাকে। তাকে দেখাশুনার ভার কাজের মেয়ে সন্ধ্যামণির উপর পড়ে। শোভনার এই দীর্ঘ অসুস্থতার সুযোগে সন্ধ্যামণি তার সেবা যত্নের দ্বারা পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে। শোভনা তার প্রতি একটি মমত্ববোধ জন্মে ছিল, কারণ শোভনাকে দেখার ভার সন্ধ্যামণীর উপর ছিল।

অবিনাশ শোভনার প্রতি প্রথম দিকে খুবই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। স্ত্রীর দুঃখে সে কাতর, অফিসে যাবার পূর্ব মুহূর্তে শোভনার মুখদর্শন করে সে বাইরে যেত। শোভনার ব্যথায় সে ব্যথিত। কিন্তু এখন সে সন্ধ্যামণির দিকে ঝুঁকে পড়ে। শোভনার অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে সন্ধ্যামণি অবিনাশকে সেবা করে। অবিনাশ জৈবিক দেহ চেতনায় সন্ধ্যামণির প্রতি ঝুঁকে পড়ে। সন্ধ্যামণি অবিনাশের থেকে দূরে থাকতে চায়, কিন্তু দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য অনেক সময় তাদের পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই সন্ধ্যামণিকে অবিনাশ আরো কাছে পেতে চায়। অবিনাশের অচেতন মন সন্ধ্যামণিকে নিয়ে বাসা বাঁধার স্বপ্ন দেখে, কিন্তু শোভনা রায়ের উপস্থিতি তাকে সেই কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

শোভনা তার স্বামীর ব্যথা বেদনার কথা বোঝে, কিন্তু তার পঙ্গু শরীর নিয়ে স্বামীর প্রতি যত্নশীল হতে পারে না। অবিনাশ ও সন্ধ্যামণিকে নিয়ে যা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা শোভনা উপলব্ধি করে, কিন্তু তার কিছুই করার ছিল না।

উপন্যাসের শেষের দিকে সন্ধ্যামণি ও অবিনাশের সম্পর্কটা অনেক কাছাকাছি এসেছে। দেহ বিনিময় থেকে শুরু করে বিবাহের একটি পূর্ব পরিকল্পনা অবিনাশ ও সন্ধ্যামণি রচনা করে। এখন সন্ধ্যামণি অবিনাশের স্ত্রী রূপে পরিবারের কাজকর্ম

দেখাশুনা করে। সন্ধ্যামণিকে এখন শোভনার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে একজন নার্সকে তার সেবা যত্নের ভার দিয়েছে।

শোভনা আজ বড় অসহায়, নিজের চোখের সামনে অবিনাশের চোখ ফিরিয়ে নেওয়া সে সহ্য করতে পারে না। সমগ্র উপন্যাসে এই মুহূর্তটা তৈরীর জন্যই যেন লেখক উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন।. লেখক এই ঘটনা দিয়ে এখানেই উপন্যাসের শেষ করেছেন। শোভনা মারা গেল, না বেঁচে রইল তার কোন তথ্য উপন্যাসে পাওয়া যায় না। তবে শোভনার দীর্ঘদিনের অসুস্থতা তাদের দাম্পত্য জীবনে সন্ধ্যামণিকে এনেছিল।

এই উপন্যাসে বেশি সংখ্যক চরিত্রের সমাবেশ খুব বেশি লক্ষ করা যায় না। অবিনাশ, শোভনা ও সন্ধ্যামণি এই তিনটি চরিত্রকে নিয়েই কাহিনী রচিত হয়েছে।

বুদ্ধদেবের অন্য উপন্যাসের মতো আত্মস্মৃতির পরিচয় এই উপন্যাসে নেই। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের দ্বন্দ্ব এই উপন্যাসে ফুটে উঠতে দেখি। এই উপন্যাসে অবিনাশ সন্ধ্যামণিকে পেয়ে সুখী হতে পারে নি। না পাওয়ার দ্বন্দ্ব তাকে প্রতি মুহূর্তে ব্যথা দিয়েছে। সে নিজেকে সংসার জীবনে একান্ত নিঃসঙ্গ ও অসহায় ভাবতে শুরু করেছিল। বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছেন -

"নিজেকে নিজের বাহিরে ছড়িয়ে দিতে পারে নি। আর তাই অন্যের সংস্পর্শে একটু অস্বস্তি ভাব তার কাটেনি এখনও। সে সংস্পর্শ যে কামনা করে তা থেকেও হঠাৎ কেমন সরে আসতে চায়। একা একা তার অদ্ভুত রকমের ভালো লাগা নিজের সঙ্গে দীর্ঘ, দীর্ঘ নিরবিচ্ছিন্ন আলাপের খানিকটা মস্তিষ্কপ্রসূত আনন্দ।" - ১০

"রূপালী পাখি" উপন্যাসটি রচিত হয় ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে । প্রকাশক শ্রী সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিসার্স, ৩১/১ বি. মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা - ৭০০০০৯।

লেখক আটটি পর্বে উপন্যাসটিকে ভাগ করে কাহিনী ধারাকে বিস্তৃত করেছেন। প্রতিটি পর্ব আবার ক্রমিক সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হয়েছে। এই উপন্যাসের চরিত্র সংখ্যা তিনটি।

উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র হিসাবে কপিল চরিত্রকে পাই। কপিল লাজুক প্রকৃতির, বিশেষ করে মেয়েদের কাছে সে বড়ই লাজুক। ভালোবাসা কপিলের কাছে ঈশ্বরের আশীবাদের মতো। কপিলের জীবন তপস্বীর জীবন। উপন্যাসের প্রথমেই দেখি, কপিল বসন্তের এক সকালে ঘুম থেকে উঠেছে। নানা চিন্তা ও চেতনা মিশ্রিত অনুভূতি নিয়ে সে নিঃসঙ্গতায় কোথায় যাবে ঠিক করতে পারে না।

কপিল মিনিকে ভালোবাসে। মিনির ভালোবাসার মধ্যে কপিলের মানসিক স্তরের বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই ভালোবাসা প্রথম দিকে কপিলের মনে কিছু আনন্দ ও উপভোগের বস্তু হিসেবে দেখা দিয়েছে। ক্রমে সেই অনুভূতি আরো গভীর হয়েছে। মাঝে মাঝে মিনির উষ্ণ হাতের স্পর্শ তাকে অন্য জগতে নিয়ে যায়। তার স্পর্শে মনে জাগে সুখের অনুভূতি। এই অনুভূতি কপিলের জীবনে এনেছিল নূতন জীবনে প্রবেশের মন্ত্র। কপিলের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু বাসবকে উপন্যাসের প্রথম থেকেই পাই। নিঃসঙ্গতাময় তপস্বীর জীবন থেকে বাইরের আলো পেতে কপিল বাসবের বাড়ীতে যায়। বুদ্ধদেবের অধিকাংশ উপন্যাসের নায়কের মত এই উপন্যাসেও বাসবকে সাহিত্যের একনিষ্ঠ ভক্ত ও সুলেখক হিসাবে দেখতে পাই। বাসবের স্ত্রী ছিল মৈত্রেয়ী দেবী। সে সাহিত্যের একজন সচেতন পাঠক। মৈত্রেয়ী দেবী বাসবকে সাহিত্য লেখায় উৎসাহ প্রদান করে। সাহিত্য জগতে বাসব প্রতিষ্ঠিত হোক, মৈত্রেয়ী দেবী এই কামনা করে। মৈত্রেয়ী দেবীর বান্ধবী ইলার সঙ্গে একটি সাহিত্যের আসরে কপিলের পরিচয় হয়। এখন কোন অজানা কারণে বাসব ঘুরে বেড়ায়। কোন ধূসর ভাবনা বাস্তব পৃথিবী থেকে কোন কল্পনার জগতে তাকে নিয়ে যায়।

উপন্যাসে বাসব একজন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। বাসব গল্প লেখে। লিখনের মান যাই হোক না কেন, সে সম্পর্কে তার কোন খেয়াল নেই। লিখতে হলেই ভাবতে হয়, এই ধারণা বাসবের মনে বদ্ধমূল। এবার উপন্যাসের মধ্য অংশে কপিল ও মিনির সম্পর্কের গাঢ়তম রূপটি দেখতে পাই। উপন্যাসের পঞ্চম অংশ থেকে উপন্যাসের গতি অন্য দিকে মোড় নেয়। 'ঝমর' নামে এক সাঁওতাল মেয়ে কপিলের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে। ঝমরের আচার আচরণ, জীবন যাপন সম্পর্কে সে অভিভূত হয়ে পড়ে। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে কপিলের বাড়িতেই ঝমর একদিন গভীর জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করে। কপিলের চোখের সামনেই তার মৃত্যু হয়। এর ফলে কপিল আরো বেশী বাস্তবতার সম্মুখীন হয়। এই আঘাতে তার কল্পনার জগৎ একটি মেঠো পথে নেমে আসে। এর পর

উপন্যাসের সপ্তম খণ্ডে কপিলকে মিনির কাছে যেতে দেখি। এই হতাশাগ্রস্ত জীবন থেকে একটু সান্ত্বনা পেতে মিনির কাছে ছুটে গিয়েছে সে। যে মিনিকে একদিন কপিল দূরে ঠেলে দিয়েছিল, একটি পরিচারিকার মৃত্যু দিয়ে বুদ্ধদেব বসু মিনিকে নূতনভাবে চেনার পথ দেখায়। কপিল তার ভাঙ্গাচোরা হৃদয় নিয়ে মিনির কাছে গিয়েছে এবং নিজেকে সঁপে দিয়েছে। এখনও মিনি নির্বাক, তাকে সরাসরি গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে চেয়েছে।

উপন্যাসের শেষ অংশে মিনিকে গ্রহণ করার জন্য একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেছে কপিল। মিনি তার আবেদনে শেষ পর্যন্ত সাড়া দিয়েছে। মিনির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী হবার পরেও ঝমরের যন্ত্রণা থেকে সে জীবনে মুক্তি লাভ করে নি। সাঁওতাল মেয়ের সরল জীবন যাপন তাঁর হৃদয়কে ছুঁয়ে গিয়েছিল। একটা সরল জীবনের ছাপ সে সারা জীবন বয়ে নিয়ে যায়। মিনুর সঙ্গে কাছাকাছি আসতে ঝমর যেন সাহায্য করে। এ থেকে বোঝা যায় কপিল ঝমরকে অজান্তে ভালোবেসে ফেলেছিল।

"রূপালি পাখি" উপন্যাসের নায়ক উপন্যাসের শুরুতেই নিঃসঙ্গতার জগতে প্রবেশ করেছে। কিন্তু শেষের দিকে বসন্তের সেই সকাল বেলায় সে ঘুম থেকে উঠল। আর উঠে দেখল সে একা, নিজেকে তার একা লাগছে। কপিল তার বন্ধুদের কাছে টেনে আনলেও তার একাকীত্বের জগতেই তার ভাবনা নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে ঘুরে যায়। মিনুর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী হলেও উপন্যাসের সমাপ্তিতে সেই একাকীত্বের যন্ত্রণা থেকে তার মুক্তিলাভ ঘটে না। উপন্যাসে মিনুর ভালোবাসার তিনটি স্তর লক্ষ করা যায়।

কপিল মিনুকে ভালোবাসে। মিনিকে ভালোবাসার মধ্যে কপিলের মানসিক স্তরের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই ভালোবাসা কপিলের মনে কিছু আনন্দ উপভোগের বস্তু হিসাবে দেখা দিয়েছে। ক্রমে সেই অনুভূতি আরো গুরুতর হয়েছে। মাঝে মধ্যে মিনুর উষ্ণ হাতের স্পর্শ তাকে অন্য জগতে নিয়ে যায়। সেই স্পর্শে তার প্রাণে জাগে সুখের অনুভূতি। সে ভালোবাসা কপিলের জীবনে আনে ভালোবাসার সুর।

কপিল মিনির কাঁছে গিয়েছে হতাশা থেকে মানসিক শান্তি পেতে। সে অন্তরের মাধ্যম হিসাবে মিনিকে বেছে নিতে চায়। কপিল তার ভাঙ্গা-চোরা মনের ক্ষত ও

লাজুকতা পার হয়ে মিনিকে নিজের করে নিয়েছে। মিনিও কপিলের কাছে নিজেকে সপেঁ দিল।

উপন্যাসের সমাপ্তিতে মিনির ভালোবাসার বিরহে কপিল চিঠি লিখেছে। মিনুর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী হবার পরেও সেই যন্ত্রণা থেকে সে মুক্তিলাভ করে নি। ঝমরকে সে এখন অনুভব করে। মিনিকে পেয়ে সেই জ্বালা প্রশমিত করতে চাইলেও অন্তরে ঝমরের প্রতি ভালোবাসা সে কোনদিন ভুলতে পারে নি।

"কালো হাওয়া" উপন্যাসটি বুদ্ধদেব বসু ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে লেখা শুরু করেন এবং ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা শেষ করেন। উপন্যাসটি ডি.এম. লাইব্রেরী থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রচ্ছদ ও নামপত্র এঁকেছেন শ্রী দেবব্রত রায়। মুদ্রাকর নিরঞ্জন বোস, নর্দান প্রিন্টার্স, ৩৪/২, বিডন স্ট্রীট, কোলকাতা - ৬। মূল্য - ৬ টাকা।

"কালো হাওয়া" উপন্যাসটিকে বারোটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। অনেকগুলি চরিত্রের সমাবেশ উপন্যাসে লক্ষ করি। "কালো হাওয়া" উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছিল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারীতে প্রথম মঞ্চে অভিনীত হয়। তারপর তিন, চার, পাঁচই এপ্রিল পর পর তিন দিন এই নাটকের অভিনয় হয়। তাঁর স্মৃতি কথায় প্রতিভা বসু লিখেছেন -

"বুদ্ধদেব তার "কালোহাওয়া" উপন্যাস অবলম্বন করে একটি বড় নাটক লিখেছিলেন। কোলকাতার রেডিয়োর স্টেশন ডিরেক্টর তখন প্রভাত মুখার্জ্জী নামে একটি নবীন যুবা, দেখতে অসম্ভব সুন্দর, ব্যবহার অতি মনোরম, বুদ্ধদেবকে শ্রদ্ধা করেই সে প্রথম ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ-এর বাড়িতে এলেও আমার সঙ্গে বৌদি পাতিয়ে দুদিনেই ঘরের মানুষ হয়ে যায়। অভিনয় করতে এক কথাতেই সে রাজি হয়ে যায়।"

- ১১

এর পর বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছেন -

"এরপর বেবীকে ধরলাম, বেবী হাসতে হাসতে এতো অস্থির হলো যে, মনে হল যেন এক মস্ত রসিকতা করছি তার সঙ্গে। টুনু রায় (অজিত দত্তর ডাক নাম) শুনে তো আনন্দে মূর্ছা যান আর কি।

বাজীধরেই বেবীকে আমি দলে টানলাম। পঙ্কুবাবুর স্ত্রী লীলাকে অনুনয় বিনয় করে বাধ্য করলাম দলে আসতে, দেখা গেল তবু কম পড়ছে মেয়ে। মাঝে মাঝেই বুদ্ধদেবের কাছে একটি সুশ্রী তরুণ ফুল হাতে নিয়ে দরজার বাহিরে দাঁড়িয়ে মৃদু স্বরে ডাকত, "বেয়ারা, বেয়ারা।" - এরকম ভাবে আর কেউ ডাকত না। তাই বুদ্ধদেব আগন্তুককে না দেখেই বলতেন, কে ? শেখর ? এসো এসো! ছেলেটির নাম শেখর সেন। আমাদের নাটকের কথা শুনে এবং দুটি মেয়ের জন্য আমরা আটকে গেছি জেনে সে বললো, আমি দুটি মেয়েকে জানি, তারা দেখতেও ভালো, অভিনয়ও করতে পারবেন। আমাদের সাগ্রহ সম্মতি নিয়ে সত্যি সে দুটি মেয়ে নিয়ে এসে হাজির হলো। একজন কল্যাণী মুখোপাধ্যায়, (লেখক সুধীর রঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সদ্য বিবাহিতা পত্নী) আর একজন তপতী মুখোপাধ্যায়, (কল্যাণীর ভাগ্নী)। মেয়ে দুটি প্রথম দিনই আমাদের নাটকের সব সদস্যরই প্রিয় হয়ে উঠল। কয়েক দিনের মধ্যেই আমি তাদের প্রাণাধিকা রানুদি হয়ে গেলাম - এই দুটি মেয়ে পেয়ে আমাদের রিয়ার্সাল পূর্ণবেগে জমে উঠল। পারবো না, পারবো না বলা লাজুক বেবীও সংকোচ কাটিয়ে দিব্যি মুখর হয়ে গেল। রিহার্সেল ছয় মাস ধরে চলেছিল। আনন্দের বন্যায় ভেসেছিলাম আমরা। জোর্তিময় রায় হলেন আমাদের প্রম্টার। ঘর ভর্তি হয়ে যেত লোকে। শোবার ঘরে সব সরিয়ে প্রশস্ত মেঝেতে আসর বিছানো হত। রিহার্সেল চলত যতটা; ইয়ার্কি-ফাজলামি, রসিকতা, উচ্চরোলে অকারণ হাসি, কারো পিছনে লাগা এসব চলত তার চেয়ে বেশি। সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত বারোটা বেজে যেত এক পলকে। তাও কারো উঠবার ইচ্ছে নাই। বাড়ি যাবার তাড়া নেই।

এই রিহার্সেলে মাঝে-মাঝে বিখ্যাত পরিচালক নিউ থিয়েটার্সের বিমল রায়ও আসতেন। পরে বোম্বে যান। তাঁর সঙ্গে কবে কি সূত্রে পরিচয় হয়েছিল এবং সেই পরিচয় বন্ধুত্বে পর্যবসিত হয়েছিল সে কথা মনে নেই।

রিহার্সেল যখন পেকে এলো, হাউস বুক করার এবং কার কি ধরনের পোশাক প্রয়োজন সে-সবের প্রশ্ন উঠল, তখন নিউ থিয়েটার্সের আর্ট ডিরেক্টার সোরেন সেনকে নিয়ে এলেন বিমল রায়, সোরেন সেন এসে কয়েকদিনের মধ্যেই নিজের উপর সব কিছুর দায়-দায়িত্ব নিয়ে নিলেন। আমরা সকলেই প্রায় অভাবিতভাবে নির্ভর করতে লাগলাম তার উপরে। হল তিনিই বুক করলেন, পোষাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা, মেকাপ ম্যান ঠিক করা, মঞ্চ সজ্জা সবই তখন তার হাতে। আরো অনেক খুঁটিনাটি সব প্রস্তুত

রেখে বুদ্ধদেবকে একেবারে নিশ্চিন্ত করে দিলেন। একটা সহজাত ব্যক্তিত্ব ছিল ভদ্রলোকটার। ভার গ্রহণ করার মত বুদ্ধি এবং শক্তি দুই-ই প্রবল ছিল।

আমাদের রিহার্সেল ফুরিয়ে গিয়ে স্টেজে যখন যার যার গ্রহণযোগ্যতার পরিচয় দেবার সময় হল, তখন সকলেরই মন খারাপ। পরপর তিন দিন (৩-৪-৫ এপ্রিল) শ্রীরঙ্গমে এই নাটক অভিনীত হয়েছিল। প্রশংসায় অনেক কাগজ পঞ্চমুখও হয়েছিল। টিকিট বিক্রিও কম হয় নি। তথাপি দেখা গেল ঘাটতি হয়েছে প্রায় এক হাজার টাকা।

পরে জানলাম ঐ ধারটা হয়েছিল নিউ থিয়েটার্সের কাছে পোশাক-পরিচ্ছদ, মেকাপ ম্যান, মঞ্চ সজ্জার উপকরণ ইত্যাদির জন্য। সোরেন সেন বুদ্ধদেবকে বলেছেন, ওটা নিয়ে আপনি ভাববেন না। আমি অন্যান্য কাজের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে ওটা শোধ করে দেব। এই সময়টায় সোরেন সেনই বুদ্ধদেবের প্রাত্যাহিক বন্ধু এবং সহায় হয়ে উঠেছিলেন।" - ১২

উপন্যাসের প্রথম পর্ব থেকে শেষ পর্ব পর্যন্ত বুদ্ধদেব বসু অশান্তিপূর্ণ পরিবারের ছবি এই "কলো হাওয়া" উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। পরিবারটি ছিল অরিন্দম ও হৈমন্তীর। তাদের দুই কন্যা ও এক পুত্রকে নিয়ে সুখী সংসার ছিল। দুই কন্যার মধ্যে বড়ো মেয়ে মিনি এবং ছোটো মেয়ে বুলি। মিনি বয়সে বড় হলেও বুলি চঞ্চলতার দিক দিয়ে অনেক বেশী দৃঢ়চেতা। অরুণ এই সংসারের একমাত্র ছেলে। অরুণ বিবাহিতা, অরুণের স্ত্রী উজ্জ্বলা। সে নিরীহ, সৎ ও সাংসারিক মহিলা। অরুণ ও উজ্জ্বলার একমাত্র পুত্র দীর্ঘরোগে শয্যাশায়ী ছিল।

অরিন্দমকে এই উপন্যাসে সহজ-সরল ও মুক্ত মনের মানুষ হিসাবে দেখি। সে সর্বদা প্রফুল্ল ও হৈচৈ স্ফূর্তির চড়া সুরে জীবনকে উপভোগ করতে চায়। সে মন খারাপ হলে হৈ-চৈ চিৎকারে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। কিন্তু এই মেজাজ দীর্ঘ সময় অরিন্দম ধরে থাকতে পারে না। অপরিমিত আত্ম প্রশ্রয়ই অরিন্দমের জীবন হয়েছিল অসহনীয়। সে জীবনে সংযম কোনদিন শেখেনি। তার মানসিক দিক দিয়ে ভেঙ্গে পড়ার অভ্যাস নেই। ছোট বড় সমস্ত ঘটনার আগেই তারই স্পষ্ট জবাব সকলের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ভিতরে কোন রাগ জমা রাখতে সে ভালোবাসতো। অরিন্দমের স্ত্রী হৈমন্তী ছিল ভিন্ন মেজাজের মেয়ে। হৈমন্তী মহামায়া দেবীর একনিষ্ঠ সেবিকা। দেবীকে মনে প্রাণে

এমনভাবে স্থান দিয়েছিল যে, মহামায়ার প্ররোচনায় ছেলে অরুণের বিয়ে হয়। আসলে মহামায়া ছিল ভণ্ড, মাতাল শ্রেণীর সাধু। সে হৈমন্তীকে বশে নিয়ে সংসারের টাকা পয়সা আত্মসাৎ করেছিল। হৈমন্তী ও তার পুত্র অরুণ মহামায়া দেবীর চরণতলে আশ্রয় নিয়েছিল। অরুণ নিজ স্ত্রী উজ্জ্বলার মোহর চুরি করে পালিয়ে যায়। নিরঞ্জন নামে এক যুবক অরুণের বন্ধু পরিচয় দিয়ে উপন্যাসের মধ্যাংশে অরিন্দমের বাড়িতে আসতে দেখা যায়। অরুণ নিরঞ্জনের কাছে অর্থ আত্মসাৎ করেছিল। এরপর দীর্ঘদিন অরুণ সংসার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, মা হৈমন্তীর প্রশ্রয়ে অরুণ এসে মহামায়ার চরণ তলে আশ্রয় নেয়। এদিকে অসুস্থ পুত্রকে নিয়ে উজ্জ্বলা দিন কাটাতে থাকে।

অরিন্দম এ অবস্থায় আরো বাস্তবতার সম্মুখীন হল। শুরু হল সংসারে অশান্তি। অরুণের কাছে প্রাপ্য টাকা নিতে এসে নিরঞ্জনের সঙ্গে মিনির পরিচয় হয়। প্রথম দিকে নিরঞ্জন মিনির কাছে প্রত্যাঘাত পেলেও কোনদিন সে ভেঙ্গে পড়ে নি। মনে মনে আলাদা শক্তি সঞ্চয় করে সে নবশক্তি লাভ করতে থাকে। মিনির এই প্রত্যাখ্যানের পর বুলি এসে নিরঞ্জনের কাছে ধরা দেয়। তাদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বুলি ও নিরঞ্জনের সম্পর্কের গভীরতা লক্ষ করে মিনি। বুলি এ ব্যাপারে মিনিকে সতর্ক করে দেয়। তাদের মধ্যে বাদানুবাদ শুরু হয়। এই তর্কের রেশ অরিন্দমের কানে এসে পৌছায়। অরিন্দম নিরঞ্জনের সঙ্গে বুলির বিয়ের প্রস্তাব পাকাপাকি করেন। এই শুভ বিবাহের আগে উজ্জ্বলা ও অরুণের ছেলের মৃত্যুতে বাড়িতে নেমে আসে শোকের ছায়া। উজ্জ্বলার মা, বাবা তারই নিঃসঙ্গ জীবন থেকে উজ্জ্বলাকে কোলকাতার বাড়িতে নিয়ে যায়।

উপন্যাসের শেষ অংশে উজ্জ্বলার এই প্রত্যাবর্তনে অরুণের কোন মানসিক পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। সে এখন মহামায়ার কাছে থাকে। মহামায়ার প্ররোচনায় বাড়ির অর্থ আত্মসাৎ করার নয়া কৌশল শুরু করে সে। মা ও পুত্রের এই যৌথ অন্ধ বিশ্বাস অরিন্দমের সংসার জীবনে নিয়ে আসে দুশ্চিন্তার কালো হাওয়া। এই হাওয়া শেষ পর্যন্ত বুলি ও নিরঞ্জনকে বিবাহের মাধ্যমে অরিন্দমের সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই "কালো হাওয়া"-র শেষ পরিণাম অরিন্দমের মৃত্যু উপন্যাসে দেখতে পাওয়া যায়। মহামায়ার নির্দেশে অরুণের পিস্তলের গুলিতে অরিন্দমের প্রাণনাশ ঘটে। উপন্যাসের শেষে হৈমন্তী ও পুত্র অরুণ ভুল বুঝতে পারে। মহামায়ার কাছ থেকে তারা দূরে সরে যায়।

"কালো হাওয়া" উপন্যাসটি বুদ্ধদেবের বাস্তব প্রবণতার প্রতি আনুগত্য লক্ষ করা যায়। বুদ্ধদেব খাঁটি ঔপন্যাসিকের মত জীবন অভিজ্ঞতা এই উপন্যাসে অঙ্কন করেছেন। বুদ্ধদেব এতদিনে কাব্য থেকে উপন্যাসকে আলাদা করে দেখতে চেয়েছেন বলে মনে হয়। এই উপন্যাসে বুদ্ধদেবের ভাষার সংযম, মানসিক ঘাত প্রতিঘাতের দৃঢ় রূপটি দেখা যায়। উপন্যাসের চরিত্রে উপলব্ধির গভীরতা, বিশ্লেষণের সাবলীল নৈপুণ্য ও ঘটনা প্রবাহের সুদক্ষ নিয়ন্ত্রণ- এসবই ছিল বুদ্ধদেবের মুন্সীয়ানার পরিচয়। অরিন্দম, মিলি, হৈমন্তী, বুলু, অরুণ, উজ্জ্বলা - অরিন্দমের পরিবার বর্গের আদর্শ বিরোধ ও পরস্পরের প্রতি বিমুখতার মিশ্র মনোভাব উপন্যাসে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সমগ্র পরিবারের উপর মা মহামায়ার সর্বনাশী প্রভাবের ছায়াপাত ঘটেছে। তীব্র লেলিহান জিহ্বায় মা মহামায়া অরিন্দমের পরিবারকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। হৈমন্তীর অন্ধ আনুগত্যের বশে মহামায়া পরিবারের কাছাকাছি আসতে পেরেছিল। অরুণও শেষের দিকে মহামায়ার নির্দেশে বাবা অরিন্দমকে হত্যা করেছে। এই সাংঘাতিক অভিজ্ঞতার ফলে হৈমন্তীর বিকার ও তার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। বাড়ির লোকের নিদারুণ ছোটাছুটি ও অর্থহীন বিশ্বাস একটি পরিবারের ধ্বংসের এক চূড়ান্ত পরিণতি বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন।

"কালো হাওয়া" উপন্যাসের মধ্যে বুদ্ধদেব বসুর বাস্তবতার পথগ্রহণ ও কাব্যের ঝোঁক কেটে যাওয়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছে বলে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেছেন। কাব্য ও উপন্যাস যে আলাদা এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু চরিত্রের তর্ক-বিতর্কের মধ্যে দিয়ে তা তুলে ধরেছেন।

অরিন্দম, হৈমন্তী, মহামায়া, মিনি, বুলি, উজ্জ্বলা - অরিন্দম পরিবারবৃত্তের আদর্শ বিরোধ ও সন্দেহপ্রবণ প্রীতি বিমুখতা পরিবারের সর্বনাশের আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। মহামায়ার সর্বনাশা প্রভাব পরিবারের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়েছে, হৈমন্তীর স্বামীকে গুলি করা এবং পরবর্তী নানা ঘটনার মধ্যে হৈমন্তীর উদভ্রান্ত মনের ছবি লেখক প্রশংসনীয় ভাবে এঁকেছেন।

"চৌরঙ্গী" উপন্যাসটি ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। "প্রগতি" পত্রিকায় উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাসের প্রকাশক এম.সি. সরকার এণ্ড

সন্স প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা এর পক্ষে শ্রী সুপ্রিয় সরকার। ক্রাউন সাইজ, ৬+১১৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ৪ টাকা।

উপন্যাসটিতে অনেক লেখকের লেখা অংশ এতে প্রকাশিত হয়েছিল। বুদ্ধদেব বসু উপন্যাসটি শুরু করলেও প্রভূ গুহঠাকুরতা, শচীন্দ্রনাথ কর এই উপন্যাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ লিখেছিলেন। অনেক সমালোচক উপন্যাসটিকে "বারোয়ারী" উপন্যাস বলে থাকেন। উপন্যাসটির চারটি অংশে সমগ্র কাহিনী নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। কোন লেখক কোন অংশ লিখেছিলেন তার পুরো বিবরণ নীচে দেওয়া হলো।

প্রথম অংশ ঃ আরম্ভ - বুদ্ধদেব বসু। (পৃঃ ৪০ - ৪৩)
দ্বিতীয় অংশ ঃ সুহাসিণীর কথা - প্রভূ গুহঠাকুরতা (পৃঃ ৪৪-১১১)
তৃতীয় অংশ ঃ ক) মালতির কথা - শচীন্দ্র নাথ কর (পৃ ঃ ১১২ - ১৯৮)
খ) বিজয়কৃষ্ণের কথা - শচীন্দ্র নাথ কর (পৃ ঃ ১৯৯ - ২৬৭)
চতুর্থ অংশ ঃ শেষ - বিপ্রদাস মিত্র - (পৃঃ ২৬৮ -৩২৩)
(বিপ্রদাস মিত্র বুদ্ধদেব বসুরই ছদ্ম নাম)

উপন্যাসের প্রথমে সুহাসিণীর পরিবারকে পাই। তার অভিজাত পরিবার ছিল। সুহাসিণীর একমাত্র মেয়ে মালতি। সুহাসিণীর স্বামী রেবতিমোহন সৎ ও সংসার সম্পর্কে উদাসীন এক ভাবুকী মানুষ। সুহাসিণী মালতির বিয়ে নিয়ে দুঃচিন্তার অন্ত ছিল না, তার দুচোখে ঘুম নেই, কারণ মেয়ের বিয়ে দেবার মতো আর্থিক সংগতি না থাকায় তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এই আর্থিক দুঃচিন্তা সুহাসিণীকে উন্মাদের মতো করে তুলেছিল। এই অবস্থায় সুহাসিণীর মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য ভাসুরই ছিল একমাত্র ভরসা। বরিশালের ছেলে সুরেশ দাসের সঙ্গে মালতির বিয়ে নিয়ে প্রাথমিক দেখাশুনা শুরু হয়। সুরেশের বাবা মাতাল। সুরেশ ছবি আঁকে, শখ ছিল বাঁশি বাজানো। সুতরাং এমন পাত্র সুহাসিণীর ভাশুরের মত হবে কিনা এ নিয়ে তার সংশয় দেখা গিয়েছিল। মালতির জ্যাঠামশায়ের এই বিয়েতে আপত্তি থাকায় সুরেশকে পাত্র হিসাবে বেছে নিতে সুহাসিণী ব্যর্থ হলো। এদিকে মালতির হৃদয়ে অপূর্ব নামে এক কারখানা মালিকের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অপূর্বের বাবা জ্যোর্তিময়ের এই বিয়েতে সম্মতি ছিল না। কিন্তু অপূর্ব ও মালতির পারস্পরিক আকর্ষণ উভয়কে আরো কাছাকাছি এনেছিল। অপূর্ব মনের সৌন্দর্য ও কামনায় তাকে সম্ভাষণ করে। মালতির আধময়লা কাপড়খানি এলোমেলো চলাফেরা অপূর্বকে আকর্ষণ

করে। উপন্যাসের একটা অংশে একটি সময় দেখি তাদের প্রেম বিয়েতে রূপান্তরিত হতে চায়। মালতির সঙ্গে অপূর্বর বিয়ে উপন্যাসে না দেখালেও তাদের দুজনেই পরস্পরকে জীবন সঙ্গিনী হিসাবে মেনে নিয়েছিল। বুদ্ধদেব বসুর অন্যান্য উপন্যাসের মত এখানে দেখি মালতি-অপূর্ব দেহ বিনিময়ের দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসটি শেষ হতে। উপন্যাসের শেষে বুদ্ধদেব বসু অপূর্ব-মালতির প্রেমকে সম্মতি জানিয়ে সুহাসিনীর মতামত দিয়ে উপন্যাসটি শেষ করেছেন। এখানে বুদ্ধদেব বসু প্রেমকেই বড় করে তুলেছেন। বাবা মা শেষ পর্যন্ত আত্ম সমর্পণ করেছে -

"অপূর্ব রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করলে, আমি আর কেউ হলাম। তুমি তাহলে সব জানো, মালতি ?

মালতি শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলে, হ্যাঁ, আমি জানি বলেই তো - বলে অপূর্বর মাথা ওর বুকের উপর শক্ত করে চেপে ধরলো।

অপূর্বর কানের কাছে মালতির হৃদয় দ্রুত ছন্দে স্পন্দিত হতে লাগলো। অনেক্ষণ ধরে অপূর্ব সেই উদ্দাম ধ্বনি শুনলে চুপ করে। ঐ হৃদয় ওর। চিরকালের মতো ওর। ঐ হৃদয় ও ওকে দিয়েছে - চিরকালের মতো।

ঐ হৃদয় ওর।

সুহাসিণী একবার মালতীকে ডাকতে এসে দরজা থেকে ফিরে গেল। অন্ততঃ আজকের রাত্তিরটা ওরা একলা কথা কয়ে কাটাক" - ১৩

গ) দেহ চেতনা মূলক উপন্যাস ঃ

বুদ্ধদেব বসুর অনেক উপন্যাসে দেহসর্বস্বতায় নর-নারীরা সুখী হতে পারে নি, এ থেকে নর-নারীরা পেয়েছে ব্যথা, বেদনা ও যন্ত্রণা। দেহকে ঘিরে প্রেমের রহস্যময় সত্তার আর্তনাদ বুদ্ধদেবের উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই। সাময়িক গল্প বলার ছলে উপন্যাসে নারীর রূপ সৌন্দর্যের মোহে পুরুষদের আকর্ষণ অনুভব করলেও এখানে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি। বুদ্ধদেব যৌন চেতনাকে তাঁর উপন্যাসের নর-নারীর চরিত্রে দেখিয়েছেন। একে প্রতিষ্ঠা করাই বুদ্ধদেবের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। তাই দেহ চেতনাকে বিশ্লেষণ করতে তিনি তেমন-আগ্রহ দেখান নি। এটা মূলতঃ তুলে ধরেছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তেরা সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ থেকে

কিভাবে নিজেদের বাঁচিয়ে চলতেন তার সুখ প্রিয় মনোভাবকে উপন্যাসে দেখতে পাই। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি এই পর্বের উপন্যাসের চরিত্রদের আগ্রহ দেখা যায়। বুদ্ধদেব পাশ্চাত্য কালচারের সংস্পর্শে দাম্পত্য জীবন কি প্রভাব ফেলেছিল এবং নর নারীরা কিভাবে জীবনকে উপভোগ করেছিল তার ছবি এঁকেছেন। মূলতঃ এটা ছিল সমকালীন সমাজের ব্যঙ্গ প্রবণতা। এই ব্যঙ্গ মূলতঃ উচ্চমধ্যবিত্ত ও ধনী সমাজ থেকে এসেছিল। তারই নিস্ফল, অন্তঃসারশূন্য প্রেমের যন্ত্রণা লেখক উপন্যাসে দেখিয়েছেন। যেমন "যবনিকা পতন" উপন্যাসে চরিত্রগুলি পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে, অথচ তারা শিক্ষা সংস্কৃতিতে ছিল উচ্চমানের, কিন্তু তাদের জীবনে কোন স্থিরতা নেই। ভালোবাসার নামে সাহিত্য আড্ডায় মিলিত হয়, এক ভয়ঙ্কর যৌন ক্ষুধার তাগিদে চরিত্রগুলি সব কিছু ধ্বংস করতে চায়। তাই এই উপন্যাসের খল চরিত্র মৃগাঙ্ক বন্ধুর বান্ধবীকে ভোগ করেছে, আবার সে শেষ পর্যন্ত বন্ধু মৃগাঙ্ককে খুনও করেছে। তবুও মুক্তির স্বাদ সে পায় নি। সে অর্থ সংকটে ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত ছিল। শুধু মৃগাঙ্ক নয়, প্রেমকে বিবাহে পরিণত করার তাগিদ আমরা কোন চরিত্রের মধ্যে দেখতে পাই না। শুধু শরীরকে পাবার আশায় তারা যৌবন জোয়ারে ভেসে বেড়ায়। এই ধরনের উপন্যাস গুলি হলো "যবনিকা পতন", "মন-দেয়া-নেয়া", "হে বিজয়ী বীর" ইত্যাদি।

"যবনিকা পতন" বুদ্ধদেব বসুর একটি অন্যতম উপন্যাস। উপন্যাসটি ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে লেখা শুরু হয়। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাস থেকে উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে। প্রকাশক ঃ ডি.এম. লাইব্রেরী, ক্রাউন সাইজ। ৪+২৫২ পৃষ্ঠা। মূল্য ৪ টাকা।

"যবনিকা পতন" উপন্যাসটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রতিটি খণ্ডের আলাদা নামকরণ আছে।

প্রথম খণ্ড ঃ দুই বন্ধু

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ অঞ্জলী বসুর প্রেমোপাখ্যান।

তৃতীয় খণ্ড ঃ অতি-পুরাতন বিরহ-মিলন কথা।

উপন্যাসটির প্রত্যেকটি খণ্ড আবার কয়েকটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডের তিনটি পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় খণ্ডের চারটি পরিচ্ছেদ এবং তৃতীয় খণ্ডে চারটি পরিচ্ছেদ আছে।

"যবনিকা পতন" উপন্যাসের নায়ক অমিয়। সে ভোগবাদী ও মাতাল শ্রেণীর চরিত্র। মৃগাঙ্ক তার বন্ধু। মৃগাঙ্কর প্রিয় শখ ছিল কবিতা ও গল্প রচনা করা। মৃগাঙ্কের বন্ধু ইন্দ্রজিতের মাধ্যমে অঞ্জলী বসুর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। অঞ্জলী বসু তার লেখার একমাত্র ভক্ত। স্ত্রী জাতির প্রতি তার যে খুব অনীহা আছে তা নয়, যেহেতু অঞ্জলী বসু কবিতা লেখে তাই তার প্রতি একটা হৃদ্যতা। অঞ্জলী বসু দীর্ঘ পত্র লেখে মৃগাঙ্ককে তার ভালোবাসার কথাটি জানাতে চায়। মৃগাঙ্ক নীরব, নিস্তব্ধ ও ভাবুক প্রকৃতির। মন নিয়ে সে বিষয়টি অনুধাবন করে। সে সাহিত্য সাধনার মধ্যে দিয়ে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চায়। প্রেম নিয়ে আলাদা করে ভাববার অবকাশ তার নেই।

অঞ্জলী বসু সাধারণ ঘরের মেয়ে। বাবা ইনকাম ট্যাক্স অফিসের কেরানী। মা ছায়াময়ী দেবী সাধারণ গৃহবধূ। অঞ্জলী গান ভালোবাসে। কবিতা লেখার হাতও তার মন্দ নয়। তার কবিতা মৃগাঙ্ককে পড়িয়ে সে আনন্দ পায়। মৃগাঙ্কের কবিতা, গল্প তাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল।

অমিয় এই উপন্যাসে একটি খল চরিত্র। সে কর্পোরেশন অফিসের কেরানী, কিন্তু তার উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের জন্য সে প্রতি মুহূর্তে অর্থাভাবে পড়ে। অপরকে ঠকিয়ে, ধাপ্পা দিয়ে অর্থ আদায় করা তার অভ্যাস। এক জনের কাছ থেকে ধার করে আরেক জনকে শোধ করে সে। এত অর্থ কষ্টের মধ্যেও সে বিলাসিতা করে। বিলাসিতা তার জীবনের অঙ্গ। সে নবাবী চালে চলতে চায়। আবার ভিখারীর মতো ঋণের জন্য ছোটাছুটি করে। সে নীতি, আদর্শ বিসর্জন দিয়ে চাটুকতা ও প্রতারণার মধ্যে দিয়ে মানুষকে ঠকায়। অপরদিকে তার বন্ধু অমিয়র মাতলামির মধ্যেও তার নিঃসঙ্গতাবোধ ও যন্ত্রণা লুকিয়ে ছিল। ইলা নামে এক রমণীকে ভালোবাসা ও ব্যর্থতার মধ্যে অমিয়র চরিত্রের এক নূতন বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।

এই উপন্যাসের মধ্যাংশে অঞ্জলী বসুকে স্কুলের শিক্ষিকা রূপে আমরা দেখি। অঞ্জলী বসু অমিয়ের প্রেমের ফাঁদ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চায়। অমিয়র প্রেমের অভিনয়ের কাছে সে যেন হার মেনেছে। অঞ্জলী বসু দেহ চেতনার কাছে যেন আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারে নি। অন্যদিকে মৃগাঙ্কের নারীর প্রতি অটল ধৈর্য্য অঞ্জলী বসুকে ধৈর্য্যহীন করে তুলেছিল। অঞ্জলী যা বলতে চায় সে বুঝেও যেন এড়িয়ে যায়। অঞ্জলী তার ভালোবাসার ডালা সাজিয়ে যখন মৃগাঙ্কের কাছে নিয়ে যায় তখন সে

কবিতা লেখায় ব্যস্ত। দীর্ঘ পত্রের দ্বারা তাকে কাছে আনার জন্য যে মানসিকতা আমরা উপন্যাসে দেখতে পাই, তার বহিঃপ্রকাশ মৃগাঙ্ক চরিত্রে ঘটে নি।

অমিয় ছায়াময়ীকে ভুল বুঝিয়ে মৃগাঙ্ককে তিরস্কৃত করেছে। বন্ধুর মর্যাদা রক্ষা তো করেই নি বরং তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে। অমিয় সব সময় আবেগের দ্বারা নীচু, হীন, ভেদবাদী মানসিকতায় পরিচালিত হতো। নিজের অহমিকাই বারবার তার ধ্বংস ডেকে এনেছিল। মৃগাঙ্ককে ফোন করে সেই ধ্বংস আরো তীব্র আকার ধারণ করেছিল। নিজের বংশ মর্যাদা ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের দরুণ তার এই করুণ পরিণতি আমরা উপন্যাসে দেখতে পাই।

বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসে অমিয়র এই মনোভাবকে যেন নিন্দা করেছেন। সে নিজের পবিত্রতা ধরে রাখতে পারে নি। গোটা উপন্যাসের মধ্যে অমিয় চরিত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা লক্ষ করা যায়।

"যবনিকা পতন" উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু প্রবল আদিম যৌন চেতনার উচ্ছ্বাস যে কতটা নীচে পৌঁছোতে পারে তার এক বীভৎস চিত্র অঙ্কন করেছেন। এই উপন্যাসে দেহ চেতনার আকর্ষণকে মৃত্যু পর্যন্ত গড়িয়ে নিয়ে গেছেন লেখক। দেহ চেতনা ও কাব্য চেতনার মিশ্রণে বুদ্ধদেব বসু তার উপন্যাসে আলাদা মাত্রা এনেছেন। যৌন চেতনার এই দেহবাদী ভাবনার পরিচয় বুদ্ধদেব বসু "যবনিকা পতন" উপন্যাসে দেখিয়েছেন। উপন্যাসের নায়ক অমিয় ছিল উগ্র মনোভাবের। বন্ধুকে সে অপবাদ দিতে দ্বিধা করে নি। ইলার কাছে অমিয়ের ছলনা ধরা পড়ে যায়। মৃগাঙ্ককে অমিয় ফোন করেও শান্তি পায়নি, বরং আরো হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল। অমিয়কে বলতে শুনি -

"তবু এক একটা সময় আসে, যখন আমার সব কাজের তারা ফাটা বুদবুদের মতো মিলিয়ে যায়, বিস্তীর্ণ দশদিক একেবারে ফাঁকা-নিঃসীম মহাশূন্যে আমি ঝুলছি- আমি যেন আর নেই।" - ১৪

মৃগাঙ্কের চিঠির মধ্যে একাকীত্বের যে ছবি ফুটে উঠেছে তার সূত্র ধরেই এগিয়ে যাওয়া যায় উপন্যাসের পরিণতির দিকে। অমিয়ের এই বৈশিষ্ট্য মৃগাঙ্ক ভালো করেই জানতো। কিন্তু অমিয়কে অর্থ অনুযায়ী চলার পরামর্শ দিলে সে রেগে যেত। মৃগাঙ্ককে

পরক্ষণে কৃপণ ব্যক্তি নামে তার কাছে তিরস্কৃত হতো। অন্যদিকে অমিয়ের আরেকটি প্রেমের কাহিনী ইলা চরিত্রকে নিয়ে দেখা যায়। ইলা শিক্ষিতা ও রুচিশীল মহিলা। সে অমিয়ের ছলনাময় প্রেমের অন্তসারশূন্যতা প্রথমে বুঝতে পারে নি। তাই ইলা অমিয়কে ভালোবাসতো। অমিয়র পিছনের এই কু-আদর্শ অজ্ঞাত থাকায় অঞ্জলী ও অমিয়র ভালোবাসা অনেকটা কাছাকাছি এসেছে। অমিয়কে ধরে অঞ্জলীর বাড়িতে মৃগাঙ্ক প্রবেশ করে এবং নির্জনতার নীরব গৃহকোণে অমিয়র হাতেই অঞ্জলী বসু ধর্ষিত হয়, কিন্তু এই অপবাদ মৃগাঙ্কের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। চরিত্র অনুযায়ী মৃগাঙ্ক যে অঞ্জলীর সর্বনাশ করবে এটা অনভিপ্রেত। কিন্তু বদনাম হয় মৃগাঙ্কের। মিথ্যা অপকর্মের বোঝা মাথায় নিয়ে মৃগাঙ্ক ছটফট করতে থাকে। অঞ্জলী নীরবে সবই সহ্য করে। অঞ্জলীর মা ছায়াময়ী দেবী মৃগাঙ্ককে নিজের ছেলের মতো ভালোবাসতো। মৃগাঙ্কের এই অপকর্মে সে গভীরভাবে মর্মাহত হয়। ছায়াময়ীর কাছে এই ব্যাপারে মৃগাঙ্ক তিরস্কৃত ও অপমানিত হয়। মৃগাঙ্ক নিজেকে ঠিক রাখতে না পেরে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। কারণ এতদিন সে মুখ বুজেই বন্ধুর নীরব অত্যাচার সহ্য করেছিল। মৃগাঙ্কের কাছে অমিয়ের নীচুতার শেষ অবস্থাটি ধরা পড়ে। কিন্তু এই প্রতিবাদই হয় তার জীবনের কাল। মৃগাঙ্ক এতদিন অমিয়কে উচ্ছৃঙ্খল ও যৌনকামী পুরুষ হিসাবে জানত। কিন্তু আজ অমিয়র কাছে প্রতিবাদ করতে গিয়ে কাঁচের তৈরী কাগজ চাপা দেওয়ার বস্তুটির আঘাতে মৃগাঙ্ক ভূপতিত হয়। এই ঘটনাটি অমিয়র নিজের বাড়িতেই ঘটে। সেখানেই মৃগাঙ্কর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় উপন্যাসে মৃগাঙ্কের মধ্যে কোন ভাবান্তর লক্ষ করা যায় না। মানুষের নিষ্ঠুরতার সর্বশেষ স্তর এখানে প্রত্যক্ষ করা যায়। অমিয়ের ব্যক্তিত্ব অনেক বড়। সে তুলনায় মৃগাঙ্ককে অত্যন্ত নীচু ও পিশাচ শ্রেণীর মানুষ হিসাবে লেখক অঙ্কন করেছেন। সমগ্র উপন্যাসে যৌনতা মৃগাঙ্কর চরিত্রের মধ্যে দেখা যায়। শেষের দিকে এই নেশা থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারে নি। যার ফলে অমিয় মৃগাঙ্কের হাতে খুন হয়।

"মন-দেয়া-নেয়া" উপন্যাসটি ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে রচিত হয় এবং ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ক্রাউন সাইজ। ৬ + ১৫৪ পৃষ্ঠা। প্রকাশক ঃ এম.জি. সরকার এণ্ড সন্স। গ্রন্থাকারে প্রকাশ ঃ জুলাই ১৯৩২। মূল্য - ১টাকা ৭৫ পয়সা। উৎসর্গ পত্রে লেখা ছিলঃ

"শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্রকে দিলাম"

"মন-দেয়া-নেয়া" উপন্যাসটি নয়টি পরিচ্ছদে বিভক্ত। এই উপন্যাসের অষ্টম পরিচ্ছদে সুলতা দ্বিজেনকে যে জাপানী কবিতার বঙ্গানুবাদ শুনিয়েছেন, "প্রগতি" তে অজিত কুমার ও বুদ্ধদেবের যুগ্ম নামে এটি প্রকাশিত হয়।

বুদ্ধদেব বসুর "মন-দেয়া-নেয়া" উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের "ক্ষণিকা" কাব্যের মনের কথা এখানে স্মরণ করা যায়। "মন-দেয়া-নেয়া"-র অষ্টম পরিচ্ছদে দ্বিজেনকে বলতে শোনা গেছে আমাদের মনের কোন নিজস্ব চরিত্র নেই; মন বলে কোন একটা জিনিস আছে তাও বলা যায় না। "জিনিস" শব্দটা রবীন্দ্রনাথের কবিতার সাদৃশ্যে লেখা বলে অনেক সমালোচক মনে করেন। এই উপন্যাসে তিনটি পুরুষ চরিত্র - দ্বিজেন, ঈশান, সিতাংশু এবং নারী চরিত্র সুলতা, মীরা ও মালিনী। এই তিন জন পরস্পরকে ভালোবাসে। তাদের মেলামেশায় কোন সামাজিক বা পারিবারিক বাধা নেই। তাদের মেলামেশা অন্য উপন্যাসের মতো নির্দিষ্ট ঘরে আবদ্ধ নয়। নিজস্ব গাড়ি করে কোলকাতায় বিভিন্ন পার্কে তারা ঘুরে বেড়ায়। তাদের চলাফেরার মধ্যে দিয়ে নাগরিক কোলকাতা জীবনের বিভিন্ন রাস্তাঘাট ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানের বর্ণনা পাই। এই উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্র সাহিত্যপ্রেমী। উপন্যাসে কবিতা লেখায় তাদের কম বেশী অভিজ্ঞতা আছে। তারা জীবনকে উপভোগের বস্তু হিসাবে দেখেছিলো। সাহিত্য লেখার যে আনন্দ, সে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। প্রত্যেকটি চরিত্রই চৌরঙ্গী, ধর্মতলাকে প্রেমের বিনোদনের স্থান হিসেবে ব্যবহার করেছে।

উপন্যাসের মূল দ্বন্দ্বের দিকে তাকালে একটি কেন্দ্রিয় চরিত্র ভেসে ওঠে, তার নাম ইন্দ্রজিৎ। উপন্যাসের প্রথম থেকে তৃতীয় পরিচ্ছদে এর উপস্থিতি লক্ষ করি। ইন্দ্রজিৎ স্বল্পভাষী ও সুলেখক ছিলেন। সে নির্জীব ও অলস প্রকৃতির মানুষ। তার স্বভাব মেয়েলি প্রকৃতির। মেয়েদের সঙ্গে মিশতে সে ভালোবাসতো। সে এম.এ. পাশ করে সাহিত্য চর্চাকেই প্রিয় বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছিল। সে ছিল অনেকটা অন্তর্মুখী ও ভাবুক মনের মানুষ। সত্যিকার কোন মেয়েকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতো কি না বোঝা যায় না। সে বাস্তব সম্পর্কে অনেকটা উদাসীন ছিল। তাই দ্বিজেন, ঈশান, এই ধূর্ত বন্ধু মহলে সে হাসির খোরাক হয়ে উঠেছিল। লেখক হবার সুবাদে ইন্দ্রজিৎ দু-তিনটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছিল বলে বন্ধু মহলে প্রচারিত। তার মধ্যে এক জনের নাম ছিল সুলতা। সে স্কুল শিক্ষিকা। প্রথম জীবনে সুলতার বাবা তাকে চার বার বিয়ে দিতে গেলেও তার আপত্তিতে তা বন্ধ হয়ে যায়। সুলতার গৃহ সঙ্গিনী ছিল মালিনী। মালিনী তার বাড়িতে

কাজ করলেও, সে ছিল স্পষ্টভাষী। উপন্যাসের অষ্টম খণ্ডে সুলতা ও ইন্দ্রজিতের আলাপচারিতার মাঝে মালিনী চরিত্রের আবির্ভাব।

মালিনীকে ঈর্ষা করে সুলতা। সে মালিনীর কাজ কর্মের প্রতি বিরক্তময় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। সে সুলতার বন্ধু সিতাংশুর কাছাকাছি চলে যায়। সিতাংশুর সঙ্গে সে গাড়ি চালায়, সিগারেট খায়, বড় বড় হোটেল ও রেঁস্তোরায় সময় বিনোদন করে। এক সময় সিতাংশুকে বিয়ের প্রস্তাব দিতেও দেখা যায়। উপন্যাসের শেষে দ্বিজেনকে ইন্দ্রজিতের বাড়িতে দেখতে পাই। দ্বিজেন, ঈশান, সিতাংশু ইন্দ্রজিতের বাড়িতে উপস্থিত হয়। এক সঙ্গে সুলতা ও মালিনীর আবির্ভাব ঘটে সেখানে। এই বাড়িতেই দ্বিজেন ও সুলতার দেহ বিনিময় ঘটে। দ্বিজেন চরিত্রটি উপন্যাসে সুযোগসন্ধানী, ভোগী চরিত্র রূপে দেখি। দ্বিজেনের খুড়তুতো বোন মীরার সঙ্গে ইন্দ্রজিতের পারিবারিক সম্মতিতে বিয়ের ব্যবস্থা হয়, দ্বিজেনের প্রচেষ্টায় ও প্ররোচনায় এই সম্পর্কে প্রায় ফাটল ধরে। মীরা উচ্চ শিক্ষিতা, নম্র স্বভাবের মেয়ে। উপন্যাসের শেষ অংশে তাদের বিবাহের চূড়ান্ত রূপ আমরা দেখতে পাই না। এই উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্র আপন খেয়ালে মেলামেশা করে। তার চকিত আভাস দিয়ে লেখক যেন উপন্যাসটি হঠাৎ শেষ করেছেন। ইন্দ্রজিতের বন্ধু হিসাবে সুলতার বাড়িতে দ্বিজেনের আবির্ভাব ঘটে। আবার ইন্দ্রজিতের বাড়িতে সুলতার সঙ্গে দৈহিক মিলন উপন্যাসে দেখা যায়। দ্বিজেন নিজের খেয়ালের বসে যৌন চাহিদা মেটাতেই মালিনীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। মালিনী তার লালসাময় রূপটি সহজেই ধরে ফেলে। সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

উপন্যাসের শেষ অংশে মীরা, ইন্দ্রজিৎ দ্বিজেন, সুলতা, মালিনী, সিতাংশুর কোন মিলন দেখি না। বুদ্ধদেব বসু নর-নারী এক বিশেষ মুহূর্ত কিভাবে চলা ফেরা করে তারই একটি প্রতিচ্ছবি উপন্যাসে দেখিয়েছেন।

<u>ঘ) প্রেরণাত্মক ও বিশুদ্ধ প্রেমের উপন্যাস ঃ</u>

"অকর্মণ্য" উপন্যাসটির রচনা কাল ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। নামপত্রে ও মুদ্রকের পৃষ্ঠায় ছিল - ডি.এম. লাইব্রেরী, ৬১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কোলকাতা, ১৯৩১ ডি.এম. লাইব্রেরী থেকে শ্রী গোপাল দাস কর্তৃক প্রকাশিত ও বাণী প্রেস, ৩৩ এ, মদন মিত্র লেন থেকে শ্রী সন্তোষ কুমার চট্টোপাধ্যায়

কর্তৃক মুদ্রিত। "পরিচয়" পত্রিকা, বর্ষ - ১, সংখ্যা- ৩, মাঘ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ। বিচিত্রা (বর্ষ-৫, খন্ড-১, সংখ্যা-৬ পৌষ-১৩৩৮) প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে উপন্যাসটির কিছু অংশ "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। "ভারতবর্ষ" পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় জলধর সেনগুপ্ত জানিয়েছেন- ১৫ "(১) এ সম্বন্ধে কোন কারণ জিজ্ঞাসা করবেন না; (২) সম্মান মূল্য ফিরিয়ে দিতে পারিবেন না; (৩) এ কথা আপনার ও আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে, তৃতীয় কাহারও কর্ণগোচর হইবে না। ..... এই তিনটি অনুরোধ আপনি রক্ষা করিবেন, ইহাই আমার একান্ত অনুরোধ, নিবেদন ও প্রার্থনা।"

এর উত্তরে বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছেন -

"জলধর বাবুর প্রথম অনুরোধ আমি অনায়াসেই রক্ষা করেছিলাম; দ্বিতীয়টি আমার পক্ষে রক্ষা না করাই কঠিন হতো; কিন্তু তৃতীয় অনুরোধ লঙ্ঘন করতে হলো বলে জলধরবাবুর কাছে আমি লজ্জিত, দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।" - ১৬

এই উপন্যাসটির উৎসর্গ পত্রে লেখা ছিল -

"শ্রী প্রভূ গুহঠাকুরতাকে -

সানুরাগ কৃতজ্ঞতায়.

১/১০/১৯৩১ - শ্রী বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসুর প্রথম "সাড়া" উপন্যাসে অশ্লীলতার যে অভিযোগ এসেছিল, এই উপন্যাসে পারিবারিক জীবনকেই লেখক উপন্যাসের কেন্দ্রে এনেছিলেন। এই উপন্যাসে পুরুষ অপেক্ষা নারী চরিত্র সৃষ্টিতে লেখকের সাবলীলতা লক্ষ করা যায়। এই উপন্যাসের নায়ক সরোজকে অনেকটা কাপুরুষই মনে হয়। লেখক সে তুলনায় নারী চরিত্রগুলিকে বুদ্ধিমান ও উচ্চশিক্ষিতা করে তুলেছিলেন।

"অকর্মণ্য" উপন্যাসটি ১২ টি ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে খন্ড বা পর্ব করা হয়েছে। ১ম থেকে ৬ষ্ঠ খন্ড পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে উপন্যাসটিকে খন্ডান্তর করা হয়েছে। ১ম থেকে

৭ম খণ্ড পর্যন্ত জ্যোর্তিময় বাবু, অনুসূয়া, শশাঙ্ক, রিণি এই চারটি চরিত্রের আত্মকথনের মধ্যে দিয়ে কাহিনী অগ্রসর হয়েছে। ৮ম খন্ডে রিণির ডায়েরী লেখা শুরু হয়েছে। ৫ই চৈত্র থেকে ২৮শে চৈত্র পর্যন্ত এই খণ্ডের তারিখ সন্নিবেশিত হয়েছে। ৯, ১০, ১১ তম খণ্ডের কোন ডায়েরীর তারিখ নাই। ১২ তম খণ্ডে ১লা বৈশাখ থেকে রিণির ডায়েরী লেখা দিয়ে উপন্যাসটি শেষ হয়েছে।

বুদ্ধদেব বসু "অকর্মণ্য" উপন্যাসে এক সম্পদশালী গৃহস্থ পরিবারের চিত্র এঁকেছেন। এই উপন্যাসের প্রধান কর্তা জ্যোর্তিময় বাবু। তার দুই কন্যা ও এক ছেলেকে নিয়ে সংসার জীবনের পরিচয় আমরা এই উপন্যাসে পাই। বড় মেয়ে অনুসূয়া ও ছোট মেয়ের নাম রিণি। পুত্র সরোজ দুই মেয়ের বড় ছিল। উপন্যাসে নায়িকাদ্বয় দুই সহোদরা ভগ্নী ছিল। অনুসূয়া ধীর, শান্ত এবং কনিষ্ঠা রিণি অতি আধুনিকা, সপ্রতিভ। সে কথার চটকতায় সকলকে হার মানিয়ে দেয়। তাই উপন্যাসে শশাঙ্ক খুব জোরের সঙ্গে রিণিকে ভালোবাসে এই কথাটি বলতে পারে নি। একটি অপদার্থ পুরুষ চরিত্র শশাঙ্ককে দুই বোনের মাঝে খুবই বেমানান দেখিয়েছিল। তাদের চিন্তাধারার স্রোতে শশাঙ্ককে নির্বোধ মনে হয়েছিল। সরোজের দুই ভগ্নীর চিন্তা ধারার স্রোতে বিবেক, বুদ্ধি যেন ভেসে বেড়ায়। সরোজ পুরীতে বেড়াতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। শশাঙ্কের সেবা-যত্নে সে আরোগ্য লাভ করে। সরোজ বাড়িতে ফিরে আসছে এই সংবাদে জ্যোতির্ময়বাবুর সংসারে আয়োজনের আড়ম্বরের বাড়াবাড়ি লেখক এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন। এই আয়োজন উপলক্ষে ডিনার টেবিলের ব্যবস্থা, সতেরো বছরের রিণির পিয়ানো বাজানোকে কেন্দ্র করে আয়োজনগুলি নিতান্তই অবান্তর বলে মনে হয়েছে। এইগুলি বাড়াবাড়ির ফলে লেখক উপন্যাসটিকে খানিকটা প্রহসনে পরিণত করেছেন বলে অনেকে মনে করেন।

"অকর্মণ্য" উপন্যাসে বৈচিত্র্য রয়েছে এবং সেই সঙ্গে এই উপন্যাসে নূতন ঢঙে বুদ্ধদেব এই উপন্যাস খানি লিখেছিলেন। বুদ্ধদেবের উপন্যাসে অশ্লীলতার যে অভিযোগ অনেক সমালোচক আনেন, কিন্তু এই উপন্যাসে তেমন নেই বরং আত্মীয় স্বজনদের পারিবারিক বন্ধনে উপন্যাসটি আলাদা স্বাদ এনেছিল। বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসগুলির মধ্যে এই "অকর্মণ্য" উপন্যাসটি স্বতন্ত্রতার দাবী রাখে। শশাঙ্ক এই উপন্যাসের নায়ক। সে একটা সুপ্ত বাসনা বা সংকল্পকে যেন বুকের মধ্যে সবসময় লালন পালন করত। উপন্যাসের ১ম থেকে ৬ষ্ঠ ক্রমিক খণ্ড সংখ্যায় আমরা দেখি, শশাঙ্ক বিভিন্ন গল্পের মধ্যে গিয়ে নিজেকে অতিবাহিত করেছে। অনুসূয়া ও রিণিকে নিয়ে সে গান বাজনার

এক পরিবেশ তৈরী করে। রিনি খুবই চঞ্চল ও স্পষ্ট কথার মেয়ে। তার সাহসী কথাবার্তায় শশাঙ্ক মুগ্ধ হয়ে ওঠে। শশাঙ্ক রিণিকে ভালোবাসে। এই ভালোবাসাটা ছিল খুবই নীরবে ও সন্তর্পণে। রিণিকে তার ভালোবাসা স্বীকার করানোর চেষ্টা উপন্যাসের শেষ অংশ পর্যন্ত দেখা যায়। অনুসূয়া ছিল রিণির ঠিক বিপরীত মনের মেয়ে। রিণির চারটি খেলা দিয়ে বুদ্ধদেব বসু তার মনের কথা জ্যোতির্ময় বাবু, রিণি, অনুসূয়া ও শশাঙ্ক শিরোনাম দিয়ে প্রকাশ করেছেন। শশাঙ্ক কী বলতে চায় রিণি তা এই খেলার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। আবার শুরু হয় রিণির ডায়েরী লেখা। ৫ই চৈত্র থেকে ২৮শে চৈত্র পর্যন্ত এবং দ্বাদশ খণ্ডে ১লা বৈশাখে ডায়েরী লেখার মধ্যে দিয়ে রিণির মনের ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। উপন্যাসের শেষ অংশ পর্যন্ত এই ডায়েরীর তারিখ ছিল। এই ডায়েরী লেখার মধ্যে দিয়ে আমরা জানতে পারি অনুসূয়া অসুখে পড়েছিল। শশাঙ্ক নিয়মিত তার সেবা করে।অনুসূয়ার আরোগ্য লাভের পর সরোজ, শশাঙ্ককে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। অনুসূয়ার সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব খুবই আকস্মিক ঘটনা। কারণ শশাঙ্ক রিণিকে ভালোবাসে। কিন্তু রিণির পক্ষ থেকে সে ধরনের সাড়া আমরা উপন্যাসে কোথাও দেখি না। শেষ পর্যন্ত শশাঙ্ক রিণিকে ভালোবাসার কথা মুখে বলতে পারে নি। এই ঘটনা দিয়ে উপন্যাস শেষ হয়েছে। বাধ্য হয়ে সে অনুসূয়াকেই জীবন সঙ্গিনী হিসাবে মেনে নিয়েছিল।

বুদ্ধদেব বসুর নারী চরিত্র সম্পর্কে যে ব্যক্তিত্বহীনতার অভিযোগ অন্য উপন্যাসে দেখি, এই উপন্যাসে পুরুষ চরিত্র সম্পর্কে একই অভিযোগ অনেকে দিয়েছিলেন। এই ঘটনার উপর ভিত্তি করে অনুসূয়ার স্বগোতোক্তি আর রিণির ডায়েরী লেখা উপন্যাসের গতিকে অনেকটা রুদ্ধ করে দিয়েছিল। বুদ্ধদেব বসু অভিজাত পরিবারের চিত্র আঁকতে গিয়ে ডায়েরীর তারিখ উপন্যাসের ক্ষেত্রে অসঙ্গত বলে মনে হয়। প্রত্যেকটি চরিত্রই মুখে মুখে যেন গল্প বলছে। গল্প বলার মধ্যে দিয়ে চরিত্রগুলির কোন ব্যক্তিত্বের ছাপ লক্ষ করা যায় না। অনেকটা গানের জলসায় যেন প্রতিটি চরিত্র প্রতিযোগিতা করছে। স্থির বুদ্ধি ও আত্ম মর্যাদা কোন চরিত্রের মধ্যে দেখা যায় না। বিশেষ করে শশাঙ্ক চরিত্রটিতে কোন ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে নি। সুপ্ত মনোজগতের মধ্যে শশাঙ্ককে লেখক রেখেছিলেন। তাই তার ভালোবাসা রিণির কাছে অবাস্তব বলে মনে হয়।

বুদ্ধদেব বসুর "সাড়া" উপন্যাসের চার বছর পর "যেদিন ফুটলো কমল" রচিত হয়। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশক- আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, ডি.এম লাইব্রেরী। ক্রাউন সাইজ, পৃষ্ঠা ১ + ১৭৫। মুদ্রাকর - বাণী প্রেস।

"যেদিন ফুটলো কমল" উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একে নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছিল। বিখ্যাত গায়িকা (রানু সোম) প্রতিভা বসু (বুদ্ধদেবের স্ত্রী) এই উপন্যাসটির নাট্যরূপ দিয়েছিলেন "মায়া মালঞ্চ" নামে। ঢাকার পাবলিক স্টেজে এই নাটকটি অভিনয় হয়েছিল। ঢাকা শহরে স্ত্রী-পুরুষের প্রথম মিলিত অভিনয় এই নাটকটি। প্রতিভা বসু এই নাটকে দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন।

বুদ্ধদেব বসু অন্য উপন্যাসের মত "যেদিন ফুটলো কমল" উপন্যাসটিকে খণ্ড বা ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে ভাগ করেন নি। লেখক উপন্যাসটিকে বিভিন্ন শিরোনাম খণ্ড দিয়ে ভাগ করেছিলেন। উপন্যাসটি উনিশটি শিরোনাম খণ্ডে বিভক্ত। শিরোনামগুলি অধিকাংশই চরিত্র অনুযায়ী, কোনটা নায়ক নায়িকাদের আনুসঙ্গিক অবস্থার পরিপেক্ষিতে নামকরণ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি শিরোনাম যেন এক একটি ছোট গল্প। কিন্তু চরিত্রগুলির বিবর্তনে শিরোনামগুলির উপযোগিতা রয়েছে। শিরোনামগুলি হলো ঃ

১) পার্থ প্রতিম। ২) শ্রীলতা। ৩) প্রবন্ধপর্ব। ৪) সেই ব্যক্তি। ৫) শ্রীলতার বাড়িতে এক সন্ধ্যা। ৬) কবিতা। ৭) বর্ষার সুর। ৮) পরিচ্ছেদ। ৯) দু-খানা চিঠি। ১০) প্রস্তাবনা। ১১) মা ও ছেলে - ও একটি কবিতা। ১২) মানসীর মান। ১৩) পূর্বরাগ। ১৪) নতুন দিন। ১৫) প্রণয় জিজ্ঞাসা। ১৬) দেখা। ১৭) নতুন রাত্রি। ১৮) বাগানের ছায়া। ১৯) অতিরিক্ত।

উপন্যাসের প্রথমেই পার্থপ্রতিম চরিত্রটিকে পাই। পার্থপ্রতিম এই উপন্যাসের নায়ক। সে কলেজে এখন নবাগত ছাত্র। সে উদার প্রকৃতির যুবক। পুথিগত বিদ্যা অবলম্বনে সে ডিগ্রী অর্জন করার বিরোধী। এই ধরনের ডিগ্রী লাভ পার্থপ্রতিমের পক্ষে এক ধরেনের শাস্তি ও অত্যাচার।

অন্য উপন্যাসের মত বুদ্ধদেব বসুর "যেদিন ফুটলো কমল" উপন্যাসটিতে তরুণ কবিকে উপন্যাসের নায়ক করেছন। উপন্যাসের প্রথমে পার্থপ্রতিমের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হয়, নবাগত ছাত্রী শ্রীলতা কলেজে এসে এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম

পুরস্কার লাভ করে। শুরু হয় শ্রীলতাকে নিয়ে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা বিনিময়। শ্রীলতা ইংরাজী মিডিয়াম স্কুল থেকে এসেছিল, এখন সে ইংরাজী অনার্সের প্রথম বর্ষের ছাত্রী।

কলেজে অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের মতই পার্থপ্রতিমের সঙ্গে শ্রীলতার পরিচয় হয়। পরিচয়লগ্ন থেকেই বন্ধু মহলে জোর গুজব রটে যায়। কলেজে শ্রীলতার বাড়িতে পার্তপ্রতিম এবং পার্থপ্রতিমের বাড়িতেও শ্রীলতার আসা যাওয়ার মধ্যে দিয়ে প্রেমের প্রথম সোপান রচিত হয়। শ্রীলতা পার্থকে না দেখলে পত্রের দ্বারা অনুশোচনা জানায়। এরপর পার্থপ্রতিমের মা ইন্দ্রার আদর তাদেরকে আরো কাছাকাছি আসতে সাহায্য করে। পার্থপ্রতিমের মা পরোক্ষভাবে তাদের এই প্রেম সমর্থন করে। কিন্তু পার্থপ্রতিম অন্য প্রকৃতির ছেলে। শ্রীলতার সঙ্গে মেলামেশা করে বুদ্ধির আলোয় বুদ্ধিভ্রষ্ট ও আবেগ তাড়িত হয়ে শ্রীলতাকে সে প্রশ্রয় দেয় না। পার্থপ্রতিম বাস্তববাদী ও দরিদ্র ঘরের ছেলে। সুতরাং নিজের অচেতন মন শ্রীলতাকে ভালোবাসলেও নিজের আর্থিক অবস্থার কারণে ভালোবাসার প্রস্তাবটি দিতে সে ভয় পেয়েছিল। অন্যদিকে শ্রীলতাও ছিল বুদ্ধিমতি উদার মনের মেয়ে। শ্রীলতা ছিল মাতৃহারা, দাদা ও বৌদির যত্নে লালিত মেধাবী মেয়ে। পার্থপ্রতিম ও শ্রীলতার প্রেম উপন্যাসের শেষ শিরোনাম - "অতিরিক্ত" অধ্যায়ে গিয়ে শেষ হয়েছে।

শ্রীলতার দাদা কুমুদবাবু পার্থপ্রতিমকে বিয়ের ব্যাপারে পত্র দ্বারা প্রস্তাব পাঠায়। পার্থপ্রতিম এর উত্তর না দিয়ে তাদের বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। উপন্যাসের শেষ অংশে মা ইন্দ্রার সহযোগিতায় ও পরামর্শে বিয়েতে পার্থপ্রতিম সম্মতি জানায়।

এই উপন্যাসে পার্থপ্রতিম ও শ্রীলতার মধ্যে ভালোবাসার সহজ সরল, মার্জিত ও রুচিসম্মত আচরণের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়েছে। "ভালোবাসি" এই কথাটি নায়ক-নায়িকা দুজনে সম্মুখে দাঁড়িয়ে কেউ বলতে পারে নি। পত্র দ্বারা শ্রীলতা পার্থপ্রতিমকে জানিয়েছে-

"আমার সবকিছুর প্রতি তোমার সমান অধিকার।" -১৭

এই কথা দিয়ে লেখক উপন্যাসটি শেষ করেছেন।

এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসুর চরিত্র চিত্রণের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসের গঠন ও চিন্তাধারায় কেন্দ্র সংহতির পরিচয় পাওয়া যায়। পার্থপ্রতিম ও শ্রীলতার প্রেম ছিল বুদ্ধদেব বসুর মনের অনুভূতি দিয়ে সাজানো। লেখক তাদের প্রেম কাহিনীর পরিণতির দিক লক্ষ করে ঘটনাগুলিকে যেন পরপর সাজিয়েছেন। অন্যান্য উপন্যাসের নায়িকা চরিত্রের এলোমেলো মনোভাব, যৌন কামনার উচ্ছলতা থাকলেও এই উপন্যাসে তা দেখতে পাওয়া যায় না। দাম্পত্য জীবন বাঁধার আগে নায়ক-নায়িকাদের প্রণয় নিবেদনকে কেন্দ্র করে নির্লজ্জ অবৈধ প্রেম উপন্যাসে দেখা যায় না। পার্থপ্রতিম কোন অবস্থাতেই শ্রীলতাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় নি। বরং এবিষয়ে খানিকটা উভয়ের মধ্যে সঙ্কোচ লক্ষ করা যায়। শ্রীলতার মধ্যে বধূ জীবনের অপরিমেয় স্বাচ্ছন্দ্যকে বুদ্ধদেব চিরন্তন সাধারণ নারীর মধ্যে দিয়ে নিয়ে এসেছেন। শেষ একটি পত্রে শ্রীলতা ও পার্থপ্রতিমকে সম্মতি জানিয়েছে।

"যেদিন ফুটলো কমল" উপন্যাসে দেহ কামনার ও গভীর যৌন আকর্ষণ থেকে বুদ্ধদেব বসু নিজেকে সংযম রেখেছিলেন। যার ফলে উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। পার্থপ্রতিম সবসময় একটা আবেশের মধ্যে থেকে প্রেমিকাকে বোঝার চেষ্টা করেছিল। পার্থপ্রতিমের মনে অহঙ্কার ছিল, যে অহঙ্কার এই উপন্যাসে প্রেমের বিরহের ভাবটি প্রকাশে সহায়ক হয়ে উঠেছিল।

আবার পার্থপ্রতিম শ্রীলতাকে গ্রহণ করার জন্য কবিতা লেখে। শ্রীলতা ছিল পার্থপ্রতিমের জীবনের একমাত্র ভরসা। বুদ্ধদেব বসু পার্থপ্রতিমের মধ্যে পুরুষোচিত কোন লক্ষণ দেখান নি। শ্রীলতা তার মাকে হারিয়ে দাদার কাছে মানুষ হয়েছিল এবং দাদা কুমুদবাবু সবসময় স্নেহ আদরে বোনকে বড় করে তোলে। বিয়ের পরে শ্রীলতার মনোভাব সে উপলব্ধি করে। পার্থপ্রতিমকে কুমুদবাবু নিজের বোনের বিয়ের প্রস্তাব দিতে দ্বিধা করে নি। কুমুদবাবু তার উদার মনের গভীরে পার্থপ্রতিমকে মেনে নিতে দ্বিধা করেনি। শ্রীলতা ও পার্থপ্রতিমকে বিয়ের প্রস্তাব না দিলেও উভয়ের আকর্ষণ ছিল না, একথা বলা যায় না। পার্থপ্রতিমের বিধবা মাকে নিয়ে সবসময় বাড়িতে থাকতে চেয়েছে শ্রীলতা। তাদের এই সম্পর্কে অর্থনৈতিক অবস্থা বাধা হয়ে দাঁড়াবে এই বোধ ও বিবেক পরীক্ষা করার জন্য পার্থপ্রতিম হয়তো সরাসরি শ্রীলতাকে বিয়ে করতে রাজি হয় নি। তাছাড়া পার্থপ্রতিম ভেবেছিল তার মতো বেকার যুবকের পক্ষে বিয়ে করা মুখে তোলাই ছিল বোকামী। এদিকে প্রেমের গভীরতার দিক দিয়ে শ্রীলতাই ছিল পার্থপ্রতিমের

জীবনের প্রেমের কমল। যে কমলকে হাতের মুঠোয় আনতে পার্থপ্রতিম অনাগ্রহী ছিল। প্রেমের পূর্ণতার আগে নায়িকার মধ্যে অর্ন্তজ্বালার দিকটা বুদ্ধদেব উপন্যাসে দেখিয়েছে। বিচ্ছেদ বেদনা প্রেমকে মৃত করে। প্রেমের গভীরতার মধ্যে নায়িকা সবসময় প্রহর গুণেছে। তার অন্ত বেদনার কথা দাদা না বললেও পার্থের পাহাড়প্রমাণ ব্যক্তিত্বের কাছে শ্রীলতার একটা দুর্বলতা ছিল। পার্থপ্রতিম একবার না করলে সহজে ফিরবে না এ ধারণা ছিল শ্রীলতার। শ্রীলতাও পার্থপ্রতিমের বিরহ বেদনা, উপন্যাসে একটা আলাদা সুর এনেছে যা অন্য উপন্যাস থেকে আলাদা স্বাদের। বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসে দুটি চরিত্রকে প্রেমের যথার্থ মূল্য দিতে শিখিয়েছিলেন। আর এই মূল্য রক্ষা করতে গিয়ে তারা কখনও দুঃখ, কখনও নিঃসঙ্গতা, আবার কখনও বিয়ের আলাপের ব্যাপারে সবসময় জিজ্ঞাসা ও সংশয়ের মধ্যে দিয়ে তারা দিন কাটিয়েছে। পার্থপ্রতিম ও শ্রীলতার প্রেম পবিত্র মনের উপহার। শ্রীলতা অন্তর দিয়ে পার্থপ্রতিমকে চিনেছে, পার্থপ্রতিমও দেখেছে শ্রীলতাকে। বুদ্ধদেব এই উপন্যাসে নায়ক নায়িকাকে একই মেরুর মধ্যে রেখে যেন বিরহকে প্রবল করার মানসিকতা দেখিয়েছেন। লেখক শেষের দিকে দুটি পত্র লিখনের মাধ্যমে দুটি চরিত্রের মিলন এনেছিলেন।

উপন্যাসে পরিণত চরিত্র এঁকেছেন বুদ্ধদেব বসু। প্রেম কাহিনীর পরিণতি বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসে স্থির করে দেখিয়ে ছিলেন, তিনি প্রেমের চূড়ায় উঠতে নায়ক নায়িকাদের প্রশিক্ষণ দিতে চেয়েছিলেন। বুদ্ধদেব কোন বিরহমনা চিন্তাধারা উপন্যাসে দেখান নি। বুদ্ধদেব চরিত্রের মধ্যে ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এরফলে উপন্যাসের নায়ক নায়িকাদের চরিত্র তার কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল ।

"পরিক্রমা" উপন্যাসটি ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। প্রকাশক- ডি.এম.লাইব্রেরী, কোলকাতা। ক্রাউন সাইজ, ৪ + ২০৩ পৃষ্ঠা। মূল্য - দুই টাকা।

"পরিক্রমা" উপন্যাসটি আটটি খণ্ডে বিভক্ত। তিনটি দম্পতির ঘটনা দিয়ে উপন্যাসের কাহিনী রচিত। এই তিনটি পরিবার হলো- বরুণা ও প্রশান্ত, সুমিতা ও বিজন ও কুমকুম- মল্লিকা। উপন্যাসের প্রথমে রয়েছে বরুণার পরিবারের ছবি। বরুণা ও প্রশান্তর একমাত্র মেয়ের নাম বাবলি। বাবলির জন্মদিনের আয়োজন উপন্যাসের প্রথমেই দেখি। প্রশান্ত পেশায় কলেজের অধ্যাপক। তাদের দাম্পত্য জীবনে সুখ ছিল না।

কারণ বরুণা প্রথম জীবনে সোমনাথকে ভালোবেসেছিল। বরুণার বিয়ে হলেও তার বাড়িতে সোমনাথ যাতায়াত করত। বরুণা ও সোমনাথ এখন বন্ধু। বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রাখতে তারা আগের জীবনের কথা ভুলে গিয়েছিল। এখন বরুণার ননদ সুমিতার সঙ্গে সোমনাথের একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এখানেও সোমনাথ ব্যর্থ হয়। সুমিতা বিজন ঘোষ নামে এক পিশাচ শ্রেণীর ধনী মানুষকে বিয়ে করতে মনস্থ করে। এর পর দেখি বিজন ঘোষের পরিবার। বিজন ঘোষ আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী কিন্তু শিক্ষা তার মধ্যে ছিল না। তার রুচি ছিল নিম্নমানের। তার সঙ্গে কথা বলা যায় না। সে দুরন্ত গতিতে যেন সবকিছু ছিনিয়ে নেয়। এদিকে সোমনাথ উদার মনের মানুষ, তার মনে ঈর্ষা নেই। উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ড পর্যন্ত এই চরিত্রগুলির কোন ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠেনি। বরুণা ও প্রশান্তের সুখের সংসারে সোমনাথ কোন বাধার সৃষ্টি করে নি। সোমনাথ পরোক্ষভাবে বরুণাকে দিয়ে সুমিতাকে পেতে চেয়েছিল। সোমনাথ উপন্যাসের প্রথম পর্ব থেকে অষ্টম পর্ব পর্যন্ত নিঃসঙ্গতা অনুভব করেছে। এখন সোমনাথ প্রশান্তের বোন সুমিতাকে পেতে চায়। এদের মাধ্যম ছিল বরুণা কিন্তু সুমিতা বিজন ঘোষকে ভালোবাসে। সুমিতা সোমনাথের কাছে একথা অকপটে স্বীকার করেছিল। বিজন ঘোষ নির্বোধ ও অর্থলোভী ছিল সুতরাং এরকম ব্যক্তিত্বকে সুমিতা বিয়ে করুক তাতে সোমনাথের ইচ্ছা ছিল না। এই ভালো মন্দের বিচার সুমিতার মধ্যে দেখা যায় নি। কারণ সুমিতা ধনীর মেয়ে। জীবনে সুখী হবার একমাত্র শর্তই ছিল তার কাছে টাকা। সে যা চেয়েছিল তা পেয়েছিল বিজন ঘোষের কাছে। সোমনাথের দৃষ্টিতে সুমিতার মন, বুদ্ধি, আত্মা কিছুই ছিল না; শুধু ছিল তার শরীর। সোমনাথ ভেবেছিল সুমিতা তার কাছে আগুনের বন্যা। সে এতদিন সুমিতাকে ভালোবাসত এটাই তার কাছে লজ্জার। এখন বাকি জীবনের জন্য নিশ্চিন্ত হয়েছে সোমনাথ। এক সময় সোমনাথ ভেবেছিল সুমিতাকে বিয়ে করে সে সুখী হতে চায়। এখন সংসারকে সে ঘৃণা করে। এর পরে দেখি কুঙ্কুম ও মল্লিকার সংসারে কোন অশান্তি না থাকলেও তাদের আচরণ খুবই সুখের ছিল না। তারা দুজনেই পরস্পরকে ভালোবাসলেও তাদের সেই ভালোবাসার মধ্যে কোন প্রাণ ছিল না। সবসময় তারা নিজের সংসারের বিভিন্ন আয়োজনে উপন্যাসকে ভারাক্রান্ত করেছে। উপন্যাসের শেষে আবার বরুণা ও প্রশান্তের মেয়ের জন্মদিনে সকলে উপস্থিত হয়েছে। উপন্যাসে সুমিতা ও সোমনাথের সম্পর্কটা কোথায় গেল তার একটা ইঙ্গিত বরুণা দিয়েছিল। লেখক এই অনুষ্ঠান বাড়িতে তাদের সম্পর্কে বলেছেন -

"সোমনাথের হঠাৎ একবার নিস্বাস আটকে এল, সেই সূক্ষ্ম সৌরভে। কি সুন্দর, সে ভাবলে, কী সুন্দর।

দাদার এখানে এসে একটু যে নিজের মনে থাকব তার কি উপায় আছে ! বললে সুমিতা।

ঐ সোমনাথ -

সুমিতা দরজায় টোকা দিল

ঐ এলো, বললে বরুণা দত্ত।" -১৮

"আমার বন্ধু" উপন্যাসটি ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে "পরিচয়" পত্রিকায় অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বই আকারে প্রকাশ করে শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী। উপন্যাসটি শ্রী প্রভু গুহঠাকুরতাকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। ক্রাউন সাইজ। ৪ + ১৯০ পৃষ্ঠা, মূল্য - ৪টাকা।

এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু দুটি চরিত্রকে নিয়ে যেন গল্প করেছেন। লেখকের বাল্যকালের স্মৃতির বিবরণ এই উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে। উপন্যাসে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লেখকের বন্ধু লেখক হবার স্বপ্ন দেখেছে। তার বন্ধুর নাম ভবভূতি।

উপন্যাসের প্রথমেই ভবভূতি ও রামতনু মজুমদার নামে দুটি চরিত্রকে পাই। এই উপন্যাসে গৌণ চরিত্রের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। মূল চরিত্রের পাশে এদের অবস্থান অস্তিত্বহীন বলে মনে হয়। উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু রামতনু মজুমদারের জবানীতে কথা বলেছেন। রামতনু ভবভূতির বাল্য বন্ধু। ভবভূতি ছিল অতি দরিদ্র ও রোগগ্রস্ত, কিন্তু তার সাহিত্য রচনার অভিপ্রায়ের অন্ত নেই। ভবভূতি বিভিন্ন লেখা নিয়ে বন্ধুকে দেখিয়েছে। লেখক হবার যোগ্যতা তার মধ্যে ছিল না। লেখা উচ্চমানের নয়, কল্পনা শক্তির গভীরতা ছিল না। দুর্বল ও মাঝারিমাপের কিছু চরিত্রকে অবলম্বন করে ভবভূতি গল্প লিখেছেন। উপন্যাসের প্রথমেই কবি মধুসূদনের কথা উল্লেখ করেছেন বুদ্ধদেব বসু। কারণ তাঁর সঙ্গে ভবভূতি সাহিত্য লেখার সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। এই পটভূমিকায় সে সাহিত্য রচনা করে। বাল্যকালের বন্ধু, শ্রেণী সাথী ভবভূতির দীর্ঘকাল যাবৎ লেখকের সঙ্গে পরিচয় নেই। ভবভূতি ছাত্র হিসাবে নিতান্তই সাধারণ মানের। ইন্টারমিডিয়েট ফেল করে সে সংসার জীবনে নেমে পড়ে। ভাগ্যের জোরে ভবভূতি সওদাগরী অফিসে চাকুরী পায়। এক সময় দরিদ্রতা ভবভূতির জীবনকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। এখন সে বিয়ে করেছে। স্ত্রী, পুত্র, সন্তান নিয়ে সে ভাড়া বাড়িতে বাস করে।

আলো বাতাসহীন স্যাঁতস্যাঁতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দীর্ঘকাল বসবাসকালে ভবভূতি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়। রোগে এখন সে শয্যাশায়ী। বাড়ির পরিবার পরিজন তাকে ডাক্তার দেখাবার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতেও ভবভূতির মনে চলে নীরবে কবিত্বের সাধনা। কাউকে তার লেখার কথা বলতে পারে না। ভবভূতির লেখার মান উচ্চ না হলেও তার মধ্যে উৎসাহ ছিল। বর্তমানে ভবভূতিকে যক্ষ্মা রোগ গৃহন্দী করেছে। তার জীবনের কোন আশার আলো ভবভূতির মা বা ডাক্তাররা দেখতে পায় না। এই মুমূর্ষু মুহূর্তে রামতনুকে দেখে ভবভূতির বাল্যকালের সাহিত্য লেখার সুপ্ত বাসনা উৎসাহিত এবং পল্লবিত হয়েছিল। ভবভূতির লেখা কবিতা ছিল পত্রিকায় ছাপানোর অনুপযোগী। কিন্তু তার প্রচেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। ভবভূতির লেখা পাণ্ডুলিপিটি উৎসর্গ করা হয়েছিল এইভাবে -

"শ্রী রামতনু মজুমদারকে
আমার এই দীন প্রচেষ্টা
উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইলাম"

এই পাণ্ডুলিপিটি ছাপানোর জন্য ভবভূতি রামতনুকে দিয়েছিল। ভবভূতি ছিল অনুভূতিহীন মানুষ। তার অনুভূতিতে কোন কুণ্ঠা ও বিচারবোধ ছিল না। অশান্তিময় জীবনে সাহিত্যকে নিয়ে সে বাঁচতে চেয়েছিল। সাহিত্য জ্ঞান ছিল ভবভূতির সীমিত। ভবভূতির মধ্যে যা আছে তা হল, সাহিত্য সৃষ্টির অতিরঞ্জিত, হাস্যকর ও মজ্জাগত আবেগ। ভবভূতির সাহিত্য লেখার উচ্ছ্বাস শুনতে গিয়ে রামতনু বিরক্ত হয়ে ওঠে।

রামতনু বন্ধুকে লেখায় বাধা দিতে চায় নি। কিন্তু রামতনুর মিথ্যা পাণ্ডুলিপি ছাপানোর নমুনা ভবভূতি বুঝতে পারে। এখন মৃত্যু ভবভূতির দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছে। বন্ধুকে তার লেখা পাণ্ডুলিপিটি তুলে দিয়ে সে যেন মুক্ত হয়েছে। মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে ভবভূতি ভুল বুঝতে পারে। বাস্তবকে বাদ দিয়ে সে যেন এতদিন পাগলামি করেছে। তবু তার অচরিতার্থ মনের বাসনা থেকে গেল। জীবনকে তিনি যেভাবে দেখেছিলেন, তার নমুনা ছিল পাণ্ডুলিপিটি - সে কথা তিনি ভুলতে পারে নি। কারণ ভবভূতির লেখা পাণ্ডুলিপিটি ছিল ছাপার অযোগ্য। এই সত্য কথাটি রামতনু তাকে বলতে পারে নি। এইভাবে অসুস্থ শরীরে, দুর্বল কল্পনা শক্তি নিয়ে ভবভূতি ৩১২ পৃষ্ঠার একটি পাণ্ডুলিপি তৈরী করেছিল। সে রামতনুকে এই পাণ্ডুলিপি ছাঁপানোর অনুরোধ

করে। রামতনু-পাণ্ডুলিপিটি ছাপানোর দায়িত্ব নেয় এবং এটি ভবভূতির সর্বোচ্চ শ্রেণীর লেখা দাবী করে। শেষ পর্যন্ত রামতনু ভবভূতিকে বোঝাতে সক্ষম হয়। অনেক বন্ধুর আশ্রয়ে রামতনু ঐশ্বর্য্যবান হলেও ভবভূতিকে নিয়ে সে চিন্তায় পড়েছিল। ভবভূতির সাহিত্য লেখার ঝোঁক ছিল পাগলের আচরণের মত। ভবভূতি তার দরিদ্র ও কৌতূহলী মনোভাবের সঙ্গে আসল কথাটি কাউকে বলতে পারে নি। শেষে রামতনু একটি মিথ্যার কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল। রামতনু এক টুকরো কাগজ ছাপানোর নমুনা ভবভূতিকে দেয়। তাতে লেখা ছিল একটি পত্রের নাম ও লেখকের উৎসর্গকৃত নমুনা ঃ

বঙ্গের সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক,
বহুদূর বিস্তারী যশের অধীশ্বর,
অতুলনীয় লেখনীর অধিকারী
নিরহংকার, নির্মল চিত্ত
স্নেহময়, হৃদয়বান
আমার শ্রেষ্ঠ
বন্ধু

তবু রামতনুর প্রতি ভবভূতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। সেইসঙ্গে এই লেখাটা যাতে ছাপানো হয়, এবং সে আরো ভালো বই লিখবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে রামতনুর চোখের সামনেই ভবভূতি মারা যায়। বন্ধু ভবভূতির সাহিত্য লেখার প্রতি একনিষ্ঠতা, অধ্যবসায়, সততা রামতনুর মনে এক নূতন অনুভূতির সঞ্চার করেছিল।

"আমার বন্ধু" উপন্যাসে দাম্পত্য জীবনে ভবভূতিকে দাঁড় করিয়ে তার মনের বেদনা ও আকস্মিক চেতনাকে বুদ্ধদেব অনেক বেশী তাৎপর্য দিয়েছিলেন। ভবভূতি ছিল সাহিত্যিক। সাহিত্যকে কেন্দ্র করে লেখকের সুগভীর পরামর্শ সে অনুভব করেছে। বুদ্ধদেব ভবভূতির পাণ্ডুলিপি ছাপানোর মধ্যে দিয়ে নিজের ব্যক্তি জীবনের প্রকাশের সঙ্গে সম্পর্কের যেন স্মৃতি তুলে ধরেছেন। বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসে ভবভূতির মতো দরিদ্র মানুষের মধ্যে দিয়ে লেখক হবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন।

<u>ঙ) প্রেম ও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস ঃ</u>

"অদর্শনা" উপন্যাসটি ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় এবং ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বই আকারে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশ করে শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী, কোলকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ - ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে, দেব সাহিত্য কুটির, কোলকাতা। এই সংস্করণে "অদর্শনা" নামটি পরিবর্তিত হয়ে "তুমি কি সুন্দর" নামকরণ হয়েছিল। এই উপন্যাস থেকে বুদ্ধদেবের চরিত্র নির্মাণের সাবলীলতা ও শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় লক্ষ করা যায়। চারটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের কাহিনী রচিত। মানসকুমার পালিত, সরোজ, কালীতারা ও মালবিকা - এই উপন্যাসের চারটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। এই উপন্যাসে মানসকুমার পালিত উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রদের নিয়ন্ত্রণ করেছিল।

এই উপন্যাসের পর্ব বা খণ্ড দ্বারা বিভাজন দেখানো হয় নি। যা বুদ্ধদেবের অন্য উপন্যাসে দেখা যায়। এখানে তিনটি তারকা চিহ্ন দ্বারা পর্বভাগ করা হয়েছে। উপন্যাসের প্রথমে বিখ্যাত সাহিত্যিক মানসকুমার পালিতের সাক্ষাত পাই। বাংলা সাহিত্যে মানসবাবুর নাম সর্বজনবিদিত। তার খ্যাতি ও সম্মান চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এলাকার আদর্শবান মানুষ হিসাবেও সে বিখ্যাত হয়েছিল। উপন্যাসের প্রচলিত ছক থেকে বেরিয়ে বুদ্ধদেব এই উপন্যাসে প্রেমের সৌন্দর্যের বিশেষ রূপটি প্রকাশ করেছে।

মানসবাবু ছিল সেতার সঙ্গীতের নিয়মিত শ্রোতা। বেতারে নাম শুনে, দর্শন না পাওয়া গায়িকার প্রতি তার অনুরাগ জন্মায়। ঐ গায়িকাকে কাছে না পেলেও মানসবাবু হৃদয়ের মাঝে তাকে অনুভব করে। ঐ গায়িকার গান মানসবাবুকে অভিভূত করে।। সেই অদর্শনা গায়িকার নাম ছিল মালবিকা রায়। মালবিকা দক্ষিণ আলিপুরের এক উকিলের মেয়ে। অভিজাত পরিবারে সে প্রতিপালিত হয়েছিল। রূপে গুণে তার খ্যাতি বেতার জগতে ছড়িয়ে পড়ে। এই মালবিকা ছিল স্বপ্ন শয়নে তার গানের প্রেয়সী।

মালবিকার বান্ধবী ছিল কালীতারা। এই কালীতারার সঙ্গে কোন অনুষ্ঠানে মানসের পরিচয় হয়। এখন সে মানসের প্রিয় বান্ধবী। আবার কালীতারার মাধ্যমে ওই মহাশিল্পী মালবিকার সঙ্গে মানস পালিতের পরিচয় হয়। ক্রমে তাদের মধ্যে একটা গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

কালীতারার চেহারা ছিল কুৎসিত। নামের সঙ্গে তার চেহারার নামকরণ বলে মনে হয়। ক্রমে কালীতারা সাহিত্যিক মানস পালিতকে ভালোবাসতে লাগল। এই ভালোবাসা শেষ পর্যন্ত উপন্যাসে একটি নূতন গতি এনে দিয়েছিল। উপন্যাসের শেষ অংশে আমরা

দেখেছি কালীতারা ও মালবিকার মধ্যে একটি গোপন চুক্তি হয়েছিল। চুক্তিটি হল মালবিকা নাম ধরে কালীতারা বেতারে গান করবে, কিন্তু এই গানের চুক্তিটি সে সারাজীবন গোপন রাখবে। একদিন গোপন চুক্তি সকলে জানতে পারে। জনমানসে তাদের গোপন রহস্য প্রকাশ পায়। এই ঘটনার কথা কালীতারা মানসবাবুর কাছে স্বীকার করে।

উপন্যাসের শেষে দেখি কালীতারা ও মানস পালিতের মিলন দৃশ্য। তার স্বপ্নের গায়িকা আজ তার হাতের মুঠোয় মধ্যে এসেছে। এই নিয়ে উপন্যাসের আরেকটি উপকাহিনী লক্ষ করি। সেটা ছিল মালবিকা ও সরোজের মিলন। মালবিকা ও মানস পালিতের একটা বন্ধুত্বের গভীরতা দেখা গেলেও অন্তর দিয়ে মালবিকা তাকে মেনে নেয় নি। তাই সরোজ মালবিকাকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া মাত্র সে তা গ্রহণ করে। সরোজ ছিল লোভী মনের মানুষ। সে ছিল পরশ্রীকাতর ও বড়লোকের ছেলে। পরিণামে তাদের বিয়ে হয়। বিয়ের দিন মালবিকাকে ফুল উপহার দিয়েছিল মানসপালিত, অন্য উপন্যাসের নায়কের মতো এখানে মানসকে হিংসাপরায়ণ হতে দেখি না। মানস-মালবিকার দেহকে নয় সে তার গানকে ভালোবেসেছিল। সুতরাং মালবিকা ও সরোজের বিবাহ-দিনে উপস্থিত হয়ে তাদের মিলনের সৌন্দর্য মানস দু-চোখ ভরে দেখেছিল। এখানেই মানসের চরিত্রের স্বতন্ত্রতা।

মানস চরিত্রটিকে বুদ্ধদেব বসু সৌন্দর্য্যের মূর্তিমান পুরুষ হিসেবে দেখিয়েছিলেন। সে মালবিকাকে সুরে ভালোবেসেছিল, রূপে নয়। মানসের কাছে এতদিনের সুরের গোপন চুক্তি জানার পর তার আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। মানস এতদিন অজানা পথে চলেছিল। কিন্তু আজ সেই সুরের দেবী ভেসে উঠল চোখের সামনে। মানস এই সুর মূর্তিকে কোনদিন চোখের সামনে দেখতে পাবে বলে মনে করে নি, কারণ গানই ছিল মানস পালিতের কাছে একমাত্র সুন্দর, রূপের মধ্যে নয়। সুরের মধ্যে যার অবস্থান সেই মনের পূজারী ছিল মানসপ্রতিম। এখন নিজে গিয়ে সে কালীতারার ছদ্মবেশ গ্রহণ করল। দূরের অদেখা গান ঝড়ের মতো তার মনকে আরেকবার ঝাঁকিয়ে দিল। আঁকাবাঁকা অজানা পথে ঘোরাফেরা সুর আজ সে নিজের হাতে গ্রহণ করল। এখানে যেন তার সুর দেবীর কাছে লেখকের আরেকবার পরাজিত হওয়া। কালীতারা কুৎসিত ছিল ঠিকই কিন্তু তার মনের ভিতর যে সঙ্গীত ভুবন ছিল তা

অপরূপ। তার মূল্য মানসপ্রতিম দিয়েছিল। তাই মানস নিজের জীবন সঙ্গিনী রূপে কালীতারাকে বরণ করে নিল।

এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু একটা সঙ্গীতের অচেতন জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, যা সাহিত্যিক মানস পালিতের মধ্যে সুন্দর একটা সুরের জগৎ কল্পনা করালেন। এই সৌন্দর্য্য দেহাতীত যা প্রেমকে অতিক্রম করে গেছে। মানস মালবিকাকে যে ভালোবাসতেন, মালবিকাও তা অনুভব করতো। কিন্তু মালবিকার মধ্যে সবসময় একটা দুর্বলতা কাজ করছিল। মানস যখন মালবিকার সঙ্গীতের প্রশংসা করে তখন সে ইচ্ছা করে এড়িয়ে যায়। তাই সরোজকে বিয়ে করতে মালবিকা দ্বিধা করে নি। মানসকে নূতন সঙ্গীতের সুর বারে বারে হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল। আর এই হাতছানির অন্তরালেই ছিল কালীতারা। কালীতারার মুখে সমস্ত শোনার পর মানস তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে এগিয়ে আসে। সাংসারিক জীবনে প্রতিষ্ঠার চেয়েও বড় হয়ে উঠেছিল মানসের সুর সৌন্দর্য্যময় একটা উজ্জ্বল মনের আদর্শ। এখানে উপন্যাসটির স্বতন্ত্রতা বুদ্ধদেব দেখিয়েছেন।

"বাসরঘর" উপন্যাসটি ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। প্রকাশনা ডি.এম. লাইব্রেরীর পক্ষে, গোপালদাস মজুমদার, কোলকাতা। ক্রাউন সাইজ, ১+২০৩ পৃষ্ঠা। মূল্য - ৪টাকা। উপন্যাসটি ছয়টি খণ্ডে বিভক্ত।

প্রথম খণ্ড ঃ অনেক দিনের মধ্যে একদিন

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ আরো একদিন

তৃতীয় খণ্ড ঃ বাড়ি

চতুর্থ খণ্ড ঃ কালপুরুষ

পঞ্চম খণ্ড ঃ উত্তরায়ণ

ষষ্ঠ খণ্ড ঃ নতুন সূর্য

এই উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র পরাশর ও কুন্তলা। তারা দুজনেই পরস্পরকে ভালোবাসত। সাবেকী আমলের ধ্যান ধারনায় তারা বিশ্বাসী ছিল। আধুনিক যুগের রীতি নীতি গ্রহণ করার প্রবণতা তাদের মধ্যে লক্ষ করা যায় না। কুন্তলার সদিচ্ছাতে পরাশরকে সে ভালোবেসেছিল। এই ভালোবাসাকে কুন্তলার মা বিয়েতে সমর্থন জানায়। কুন্তলার মধ্যে সামাজিক দিক দিয়ে খানিকটা দোটানা ভাব দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত কুন্তলা ও পরাশরের বিয়ে হয়। কুন্তলা খেয়ালী ও আবেগপ্রবণ মেয়ে। সে যেন সমাজ সম্পর্কে উদাসীন। কুন্তলা বিয়ের পর থেকে স্বামীর ব্যবহার নিয়ে তার মনে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। সে স্বামীকে পুরোপুরি নিজের করে নিতে পারে নি। এ নিয়ে সমাজ কি ভাববে তা তার কছে বড় কথা নয়। তাই সে স্বামীর কাছ থেকে অতি সতর্কতার সঙ্গে দূরে সরে থাকতে চায়।

বিয়ের পর কুন্তলা অনুভব করেছে স্বামী তাকে কাছে পেতে চায়। এই মনোভাবকে কুন্তলা ঘৃণা করে। বিয়ের পর কুন্তলা ও পরাশর কেউই দাম্পত্য জীবনকে ঠিকমতো মেনে নিতে পারে নি। কুন্তলার পক্ষ থেকে বার বার প্রত্যাখান পরাশরকে আঘাত করেছিল। তাই জোর করে পরাশর কুন্তলার সঙ্গে দেহ মিলনে লিপ্ত হয়েছে। পরাশরের পক্ষ থেকে কুন্তলার এই উদাসীনতা তাকে বীতশ্রদ্ধ করে। তাই উভয়ের দিক থেকে সমাজ সম্পর্কে অতি সতর্কতা লক্ষ করা যায় না। এই অবস্থা শেষ পর্যন্ত দুটি চরিত্রকে পরস্পরকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। শেষে পরাশর ও কুন্তলা ভুল বুঝতে পারে। তারা দাম্পত্য জীবনকে আরো ভালোভাবে মেনে নিল। এই উপন্যাসে বুদ্ধদেবের নাগরিক প্রেমের ধারণা বিরহের আগুনে শুদ্ধ হয়ে গভীরতম ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। এই উপন্যাস সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন -

"বাসর ঘর"-এ মনস্তত্ত্বমূলক সমস্যা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট, এখানে কবিতারই অপেক্ষাকৃত প্রাধান্য।" -১৯

বুদ্ধদেব এই উপন্যাসে কঠিন বাস্তবকে উপেক্ষা করেছেন। সমাজ জীবন এই উপন্যাসে তেমনভাবে স্থান পায় নি। ফলে সমাজ জীবন বহির্ভূত এক কল্পলোকে নর-নারীদের নিয়ে "বাসরঘর" উপন্যাসে কাহিনী তৈরী হয়েছে। এই কল্পলোকের বৃত্তের মধ্যেই নায়ক নায়িকারা চলাফেরা করেছে। তাই তারা কখনও নিঃসঙ্গ ও একাকীত্বের যন্ত্রণা অনুভব করেছে। উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পরে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসের এক খণ্ড রবীন্দ্রনাথকে মতামতের জন্য পাঠিয়েছিলেন। এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন-

"তোমার গল্পের বিশেষত্ব এই যে, যেখানে শেষ হলো বই, গল্প রয়ে গেছে তার পরের দিকে। দেখালে প্রবল ভালোবাসার আত্মঘাতী দ্বন্দ্বের মধ্যেই অনিবার্য হিংস্রতা, যুগ্ম জ্যোতিষ্কের পরস্পর আকর্ষণের মধ্যে দূরত্ব থাকলে তাদের যুগলযাত্রা নিরাপদ হোত, আবেগের দুর্দ্দমতায় সেইটে কমে গিয়ে আসন্ন প্রলয় সংঘাতের আশঙ্কা উগ্র হয়ে উঠল। এই তোমার গল্প-না-বলা গল্পটিকে তুমি যে এমন করে দাঁড় করাতে পেরেছো সে তোমার কবিত্বের প্রভাবে। একটা কথা বলে রাখি, কুন্তলা নামটা ভালো লাগল না। কুন্তলা মানে চুল, আ-কার যোগ করে তাতে স্ত্রীত্ব আরোপ করা বৃথা।" -২০

বুদ্ধদেব বসু ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরের ২৯ তারিখে রবীন্দ্রনাথের এই পত্রের উত্তরে লিখেছিলেন -

"বাসর ঘর বইটা আমি যেমন করে কল্পনা ও রচনা করেছি তার মধ্যে একটু অভিনবত্ব অবশ্যই আছে। গল্পকে আগাগোড়া বর্জন করে গল্প বলা। আমার নিজের কথা বাদ দিয়ে বলতে পারি, এই ধরণের রচনা যে উপন্যাস বলে গ্রাহ্য, এই ধারণাই দেশের অনেক লোকের মনেও নেই। অথচ ভবিষৎ বাংলা উপন্যাসের যে-সব রাস্তা খোলা দেখতে পাচ্ছি এটা তার মধ্যে অন্যতম। কুন্তলা নামটি সম্বন্ধে আপনার আপত্তি সম্পূর্ণ গ্রাহ্য। - কথাটা শুনতে ভালো, কুন্তি ডাকতে ভালো, সেজন্যই নিয়েছিলাম - মানের কথা অত ভাবিনি। নাম নির্বাচনে মনের চোখ-রাঙানিকে আমাদের বাঙ্গালীদের বড় বেশি মেনে চলতে হয়, এটা খুব সৌভাগ্যও বিবেচনা করিনি। নামের ধ্বনিই আসল।" - ২১

বুদ্ধদেবের এই বাসর ঘর উপন্যাসে কুন্তলা ও পরাশরের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তা মানসিক দ্বন্দ্ব। সাধারণ দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে না। বুদ্ধদেব বসু মনস্তাত্ত্বিক ভাবনা দিয়ে চরিত্র দুটিকে অঙ্কন করেছেন। দুজনের রাগ ও ক্রোধ মূলতঃ এক পশলা বৃষ্টির মতো। ভালোবাসার উপর তাদের কোন রাগ ছিল না। আবার তাদের দ্বন্দ্বে বাইরের সাহায্যকেও তারা নিতে অস্বীকার করেছে। তারা উদাসীন ভাবে যেন একে অপরের উপর অভিমান করেছে। জীবনের এই ক্ষণস্থায়ী সংঘাতে যখনই ভুল বুঝতে পেরেছে, তখনই তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আধুনিক যুগের নর নারীর বিশেষত্ব তাদের মধ্যে দেখা যায় না। তারা যেন বুদ্ধদেবের কল্পনার ও প্রেমের ইন্দ্রজালে বিচরণকারী প্রেমিক প্রেমিকা। কিন্তু আসলে তারা দাম্পত্য জীবনে বনিবনা না হওয়া স্বামী-স্ত্রী। প্রতিদিনের পরিবারিক জীবনের যে সাধারণ ব্যাপার থাকে বুদ্ধদেব সেই কামনা ও ভাবনার নকশা এই উপন্যাসে বিস্তার করে চলেছিলেন। তারা দুজনেই যেন আত্মভোলা নর-নারী। দাম্পত্য জীবনের ঘেরাটোপে তারা অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। সবকিছু ভেঙ্গেচুরে একটা নূতনত্বের পথে তারা যেন ছুটে চলেছিল। এই উপন্যাসে শহরের জীবন কথা ছিল না। আবার পাড়াগাঁয়ের লোকের কথাও ছিল না। লেখক উপন্যাসে যেন একটি মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে নর-নারীর মনকে বিশ্লেষণ করেছেন। নিঃসঙ্গ, গভীর এক স্রোতহীন সমাজ কল্পনা করে লেখক নর-নারীর হৃদয় পরীক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। এই উপন্যাসে মানব মনের একটা বিশেষ ভাব বা বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন। কুন্তলা ও পরাশরের বিবাহিত জীবনের মুহূর্তগুলি বুদ্ধদেবের কবিত্বপূর্ণ সংলাপে ঢাকা পড়ে গেছে। প্রকৃতির অপূর্ব সৃষ্টির মাঝে চরিত্রদুটিকে বুদ্ধদেব সবথেকে উজ্জ্বল মনে করেছেন। বুদ্ধদেব বসু মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে কুন্তলা ও পরাশরের জীবনের অভিমান ও বিচ্ছেদের মূহূর্তগুলি তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয় পর্ব

বুদ্ধদেবের উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব (১৯৪৫-১৯৭২)

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে বুদ্ধদেবের উপন্যাসগুলিকে আমরা দ্বিতীয় পর্বের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। যদিও বুদ্ধদেবের উপন্যাসের এই পর্ব বিভাগ আমরা কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের ভিত্তিতে করছি তা নয়। কারণ তাঁর উপন্যাসের বিবর্তনের চেহারাটা খুব স্পষ্ট নয়। তবে এই পর্ব বিভাগকে খুব অযৌক্তিক বলেও মনে করা যায় না। প্রেম, রোমান্টিকতা, মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কল্লোলীয় যুগের নরনারীরা কিভাবে বিচরণ করেছিল, তা বুদ্ধদেবের উপন্যাসে দেখতে পাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি আরো গভীর, সজীব ও জীবন্তভাবে দেখা গিয়েছিল। প্রথম পর্বের উপন্যাসের চরিত্রগুলি যেন প্রেমের আবর্তে পড়ে দিশেহারা হতে দেখা যায়। উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত চরিত্রগুলি কোন চূড়ান্ত পরিণতি খুঁজে পায় নি। দ্বিতীয় পর্বে কিন্তু তা নয়। এই পর্বে কিছু উপন্যাস আছে যেমন, "মৌলিনাথ", "পাতাল থেকে আলাপ", "শোনপাংশু" ইত্যাদিতে দেহ চেতনা একেবারেই নেই। এখানে যেন বুদ্ধদেব বসু আদর্শ রচনার এক স্বাক্ষর রেখেছিলেন। জীবনাদর্শের এক মহান ব্যক্তির দৃষ্টান্ত তিনি এই সব উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। জীবনকে উপভোগ করেও নর-নারীরা যেন প্রবলভাবে বাস্তবের মাটিতে নেমে এসে একটি বিশেষ আদর্শ নিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। বুদ্ধদেবের প্রথম পর্বের উপন্যাস "সাড়া"তে যা দেখি দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসে সেই জৈবিক দেহ চেতনার উচ্ছ্বাস থাকলেও, তা প্রবলভাবে ছিল না।

বুদ্ধদেবের এই পর্বের উপন্যাসে প্রেমের উচ্ছ্বলতার মধ্যে দিয়ে লেখক যেন কিছু আবিষ্কার করেছেন। তবে একথা ঠিক যে, প্রেম বুদ্ধদেবের উপন্যাসের প্রিয় বিষয় ছিল। চল্লিশের দশকের পর থেকে অনেক উল্লেখযোগ্য উপন্যাস তিনি বাঙ্গালী পাঠককে উপহার দিয়েছিলেন। বিশেষ করে "তিথিডোর" উপন্যাস বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। এই পর্বের উপন্যাসে দেখা যায় প্রেমের প্রত্যক্ষ সজীব ও গাঢ় গভীর অনুভূতি, যা দিয়ে চরিত্রের মনোলোকে বার বার লেখক আলো ফেলতে চেয়েছেন। তিনি চরিত্রের মধ্যে ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন। এই পর্বে প্রেম মৃদু, হালকা ভাবে দেখা যায়। প্রেমের গতিতে এই পর্বের উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে শেষ পর্যন্ত

দিশেহারা হতে দেখা যায় না, কখনো বা প্রেমের পরিবর্তে চরিত্রে নূতন চেতনা দিয়ে লেখক পূরণ করেছেন। এই পর্বে আরো দেখা যায় চরিত্রগুলি যেন বাস্তব জগতে ফিরে এসেছে। এ প্রসঙ্গে আরো বলা যায় বুদ্ধদেব বসু প্রেমের মধ্যে দিয়ে নূতন জীবনাদর্শকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছিলেন। উপন্যাসের বিষয় ভাবনা, চরিত্র ও আঙ্গিকে একটি বিশিষ্টতা আমরা লক্ষ করি।

এবার আমরা দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসগুলিকে বিষয়ানুসারে শ্রেণী বিভাগ করবো ঃ ১) চেতনা মূলক উপন্যাস, ২) জীবনাদর্শমূলক উপন্যাস, ৩) দাম্পত্য জীবনের প্রেম ও নূতন পথের দিশারী, ৪) প্রেমের উপন্যাস, ৫) কুসংস্কার ও প্রেম

১) চেতনা মূলক উপন্যাস ঃ

বুদ্ধদেবের এই চেতনা ধর্মী উপন্যাসে সামজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে মানুষের সচেতন হবার প্রয়াস লক্ষ করি। বুদ্ধদেব এই ধরনের উপন্যাসে জীবনের কয়েকটি সুপরিচিত ঘটনাকে একটা সন্ধিক্ষণে দাঁড় করিয়েছেন। তিনি যেন সমাজের কাছে বিচার চাইছেন। তিনি দেখিয়েছেন মানুষ শিক্ষিত হলেও, অন্ধ ধর্মের মোহ পরিবারের সকলকে গ্রাস করে। বুদ্ধদেব এই পর্বে প্রত্যেকটি চরিত্রের উপর পারিবারিক প্রভাব দেখিয়েছেন। তবু পরিবারের কোন সদস্য ঐ কু-অভ্যাসে যোগ দিতে চাইলে অন্য চরিত্র তাকে অনুকরণ করে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে পরিবারের কর্তাকে নীরব দর্শকের আসনে বসে থাকতে দেখা যায়। যখন তার বংশের ঐতিহ্য একেবারে শেষের দিকে গিয়ে পৌঁছোয় তখন কোন তৃতীয় চরিত্রের অঙ্গুলি নির্দেশে গোটা পরিবার সমাজ অনুশাসন মেনে চলতে থাকে। যখন চরিত্রগুলির জ্ঞান ফিরে আসে তখন আর কিছু করার থাকে না। এই ধরনের উপন্যাসগুলি হল - "লালমেঘ", "পরিক্রমা", "কালো হাওয়া"। এই বিষয়ধর্মী উপন্যাসের চরিত্রগুলিতে মানব মনের বিকৃতি লক্ষ করা যায়।

বুদ্ধদেবের উপন্যাসের এই চেতনা প্রবণতা বলতে প্রধানত কল্লোলের চেতনাকেই বুঝে থাকি। ত্রিশের দশকে এবং চল্লিশের দশকের প্রথম দিকের উপন্যাসে বাংলাদেশে কল্লোলকে আশ্রয় করে একটি সজীব সাহিত্য আন্দোলনের মাধ্যমে একটি তরুণ গোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই সব চেতনা আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের প্রেক্ষাপটে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল। বর্তমান বিষয় পর্ব ভাগে সেই ধর্ম বিভিন্ন

উপন্যাসের মধ্যে কিভাবে এসেছিল তা তুলে ধরবো। বুদ্ধদেব বসু অবশ্যই সেকালের দেশ ও সমাজকে অস্বীকার করেন নি। আবার অনেকে তার উপন্যাস সম্পর্কে একটি অতি আধুনিক অশ্লীলতার অভিযোগ এনে ছিলেন। একথা জনিয়ে রাখা প্রয়োজন যে, সত্যিকার সৃজনশীল লেখকের মতো বুদ্ধদেব বসু সে কালের রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল সেই দিকগুলি তুলে ধরেছেন। এই চেতনা প্রবণতা এসেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে রাজনৈতিক অস্থিরতার পূর্ব মুহূর্ত থেকে। তারই প্রতিফলন বুদ্ধদেবের এই পর্বের সমস্ত উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। এই পর্বের উপন্যাসগুলিকে আলোচনা করে এই বৈশিষ্ট্যগুলি কতটা ফুটে উঠেছে তা আমরা তুলে ধরবো।

"রুকমী" উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ২৫ শে বৈশাখ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ। সম্পাদক - নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক - আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা - ৭৩। মুদ্রণ, প্রিন্ট ও গ্রাফ- ৯/সি. ভবানী দত্ত লেন, কোলকাতা- ৭৩।

"রুকমী" উপন্যাসটি বুদ্ধদেব বসুর জীবিত কালের প্রকাশিত শেষ উপন্যাস। এই উপন্যাসটি লেখার সময় বুদ্ধদেব বসুর শারীরিক অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। এই বই লেখার আগে তিনি তাঁর কনিষ্ঠ কন্যাকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন -

"পূজোয় একটা উপন্যাস, একটা নাটকের কথা দিয়েছি- আজ যে মাসের মাঝামাঝি হতে চললো, অথচ কোনটাই মনে ধরা দিচ্ছে না - আমার অবস্থা শোচনীয়। টেনে টেনে নাটকটা যদি বা শেষ পর্যন্ত পেরে উঠি, এ মুহূর্তে উপন্যাস অসম্ভব মনে হচ্ছে। কোন একটা বিবরণ লিখতে হবে, ঘটনা বানাতে হবে ও সাজাতে হবে, তা ভাবতেই যেন ক্লান্তি আসে। ভাবছি সামনের বছর থেকে উপন্যাস লেখা ছেড়ে দেব - যদিও রোজগার সেটাতেই। " - ২২

"রুকমী" উপন্যাসটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে ছয়টি এবং দ্বিতীয় খণ্ডে আটটি ক্রমিক সংখ্যায় খণ্ডান্তর করা হয়েছে। উপন্যাসের শেষে একটি খণ্ডান্তর অংশ আলাদা ভাবে দেওয়া হয়েছে। এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু ধীরাজ দত্তের জবানীতে বিভিন্ন চরিত্রর সঙ্গে কথা বলেছেন। ধীরাজ দত্ত বারো বছর আগে দার্জিলিং-এ বেড়াতে

এসে যে ঘটনা ঘটেছিল তার স্মৃতি এখানে বলেছেন। বারো বছর পর আবার তিনি দার্জিলিং-এর সেই হোটেলে বেড়াতে এসেছেন। আগে তিনি ছিলেন অবিবাহিতা, এখন পতিতা বাড়ির মেয়ে কমলাকে নিয়ে তার দাম্পত্য জীবন। পূর্ব ঘটনার স্মৃতি দিয়েই উপন্যাসটি শুরু করেছে ধীরাজ দত্ত।

উপন্যাসের কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে চৌধুরী পরিবার। হরেনবাবু ও, মৃণালিনীর চৌধুরী পরিবারের বর্ণনা ও তার চূড়ান্ত পরিণতি এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। হরেনবাবুর এক কন্যাকে নিয়ে সুখের সংসার। মেয়ের নাম রুকমিনী বা রুকমী। রুকমি ছিল আদরের কন্যা। অবনী নামে এক মেধাবী ছাত্রের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা উপন্যাসের প্রথমে দেখা যায়। এখন সে বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার। সে ব্যাঙ্গালোরে চাকুরী করে। এই পরিবারের সঙ্গে ধীরাজ দত্ত বেড়াতে গিয়েছিল এবং সেখানেই ধীরাজ দত্তের সঙ্গে অবনীর পরিচয় হয়। ধীরাজবাবু ঔপন্যাসিক হিসাবে বাড়ির সকলের কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল।

উপন্যাসের দ্বিতীয় ক্রমিক খণ্ডান্তরে দেখি রুকমীর সঙ্গে গগনবরণ মুনসীর বিয়ে। পেশায় গগনবরণ একজন বিখ্যাত ব্যারিস্টার। রাজনৈতিক মহলে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। এমন সুযোগ্য পাত্রের হাতে মেয়ে সম্প্রদান করে হরেনবাবু গর্ববোধ করে। মেয়ে রুকমীকে সকলে ভাগ্য কপালী বলে প্রশংসা করে। রুকমীকে নিয়ে উপন্যাসে আরো দুটি চরিত্র দেখতে পাই তারা হলো অঞ্জনা ও বিকাশ। কিন্তু তারা উপন্যাসের মূল ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয়।

রুকমী এখন পাটনায় থাকে। সরকারী কাজে স্বামীর সঙ্গে মাঝে মধ্যে কলকাতায় আসে। বছরে দুবার তারা দার্জিলিং-এ বেড়াতে যায়। অভিজাত, অর্থবান হরেনবাবু বেড়াতে আসার জন্য দার্জিলিং-এ দ্বিতীয় বাড়ি বানিয়েছিলেন। সে সংবাদ ধীরাজবাবুর অজানা ছিল না। বিয়ের পর দার্জিলিং এর পোষ্ট অফিস মোড়ে রুকমীর সঙ্গে ধীরাজবাবুর দেখা হয়। ধীরাজ তাদের সঙ্গে বেড়ানোর সাথী হল। রুকমী গগনবরণের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেয়। উপন্যাসের শেষের দিকে আমরা দেখছি দার্জিলিং-এর বৃষ্টি ভেজা দিনে গগনবাবু সরকারী কাজে বাইরে চলে যায়। তারই অবর্তমানে রুকমী একদিন ধীরাজবাবুর বাড়িতে এসেছিল। এখানেই উপন্যাসের গতি অন্যদিকে ঘুরে যায়। ধীরাজ এই বৃষ্টি ভেজা দিনে রুকমীকে দিয়ে তার যৌন চাহিদা চরিতার্থ করে। এই

ঘটনায় রুকমী ব্যথিত ও মর্মাহত হয়ে পড়ে। বিশ্বাস ঘাতক ধীরাজের এই আচরণ রুকমী মেনে নিতে পারে নি। নিজেকে সে অপরাধী ও কলঙ্কিনী ভাবতে থাকে। সে তার স্বামীর কাছে দাঁড়াতে লজ্জাবোধ করে। রুকমী নিজেকে ভাবে সে ব্যর্থ। এই ব্যর্থ জীবন নিয়ে একদিন সে স্বামীর ঘর ছেড়ে দিয়ে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করে। পরে অবনী ঘোষের কাছেও রুকমীর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি, কারণ অবনীকে সে প্রথম জীবনে ভালোবাসতো। এই ঘটনার বারো বছর পর সেই ধীরাজ দত্ত পতিতা কমলাকে নিয়ে আগের সেই পরিচিত গোবিন্দ বাবুর হোটেলেই উঠেছে। উপন্যাসের এই বিষয় আলোচনার পর রুকমী চরিত্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। রুকমী ছিল সহজ সরল। তার মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মসম্মানবোধ ছিল। সে সহজেই মানুষকে বিশ্বাস করতো। তাই সে সহজ সরলভাবে ধীরাজ দত্তের সঙ্গে রাস্তায় বেড়াতে গিয়েছিল।

রুকমীকে তাঁর স্বামী খুবই ভালোবাসতো। রুকমী এই ভালোবাসাকে ধরে রাখার জন্য তার ধর্ষিত জীবন স্বামীর কাছে দেখায় নি। সে বেঁচে ছিল, না আত্মহত্যা করেছিল তার কোন বিবরণ আমরা উপন্যাসে পাই না। ধীরাজবাবুর মনে সংশয়, জীবনের স্মৃতিগুলি আজ ঘুরে বেড়ায়। রুকমী নিজের কথাই ভেবে ছিল। গগনের মুখের দিকে না তাকিয়ে সে নিরুদ্দেশ হয়েছিল। এখন এই লজ্জাকর ঘটনা ভণ্ড ধীরাজের মনে পাক খায়। সেইসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু দেখিয়েছেন রুকমী নিরুদ্দেশ হয়ে তার আত্মসম্মান ও মানবিক মূল্যবোধ কিভাবে ধীরাজের মত মানুষদের আঘাত করেছিল।

"আয়নার মধ্যে একা" উপন্যাসটি ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে লেখা শেষ হয় এবং ঐ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বই আকারে প্রকাশিত হয়। দে'জ প্রকাশন, মহাত্মা গান্ধী রোড, ৩১/বি. কোলকাতা - ৯। প্রচ্ছদ- দেবব্রত রায়। মুদ্রাকর নিরঞ্জন বোস, নর্দান প্রিন্টার্স, ৩৪/২, বিডন স্ট্রীট, কোলকাতা - ৬। মূল্য - ৬ টাকা।

বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসকে ১৬টি পর্বে ভাগ করেছেন। উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু কমলার জীবনের ঘটনাকে রূপ দিয়েছিলেন।। উপন্যাসের প্রথমে দেখি শান্তি মাসির পাঁচ সদস্যের একটি পরিবার। তার মধ্যে একজন কমলা। কমলা বিধবা নারী। অল্প বয়সে স্বামী মারা যাবার পর থেকে মাসির বাড়িতে থাকে। বাড়ির সকলের কাছে সে ঘৃণ্য ও অবজ্ঞার পাত্র। বাড়ির প্রত্যেকে তার দ্বিতীয় বিবাহের সিদ্ধান্ত নিলো। পাত্র হিসেবে মেশোমশাইয়ের অফিসে বিনোদ নামে উদার, স্বাধীনচেতা যুবকের সঙ্গে তার বিবাহ

ঠিক হয়। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে তার জীবনে নেমে আসে লম্পট অম্বু। অম্বু ছিল শান্তি মাসির ভাইপো। সে শান্তি মাসির খুব প্রিয় পাত্র। অম্বুর প্রতি বাড়ির সকলের অগাধ বিশ্বাস। কমলার সুন্দর চেহারায় আকৃষ্ট হয় অম্বু। কমলাকে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করে। সিনেমায় সুযোগ করে দেবার নামে তার অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার চেষ্টা করে অম্বু। কমলা প্রথমে তার তীব্র প্রতিবাদ করে কিন্তু বাড়ির শান্তি মাসির অত্যাচারের কাছে এখন তার প্রতিবাদী মন আত্মসমর্পণ করে। শান্তি মাসি অকথ্য ভাষায় কমলাকে তিরস্কার করে। কমলার জীবনে দেখা দিল এক কালো মেঘ। অম্বুর সঙ্গে কলকাতায় কমলা দিনের পর দিন নূতন কাজের খোঁজ চলতে থাকে। কমলা নিজেকে পরিবর্তন করে নিয়েছে। অম্বুর সঙ্গে এখন সে মিশতে দ্বিধা করে না। সে আন্তরিকভাবে নিজেকে সিনেমার কাজে নিয়োজিত করতে চায়। কিন্তু অম্বু অসৎ উদ্দেশ্য রূপায়ণের জন্য কমলাকে আসানসোলের এক কয়লা ব্যবসায়ীর কাছে নিয়ে যায়। এক অন্ধকার ঘরে পরিচয়ের উদ্দেশ্যে কমলাকে যৌন নির্যাতন শুরু করে অম্বু। উপস্থিত বুদ্ধিতে কমলা সে যাত্রায় রক্ষা পায়। বন্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সে বাড়ি ফিরে আসে। অম্বু শান্তি মাসির কাছে কমলার নামে নানা কুৎসা রটনা করে। শান্তি মাসির উদ্দেশ্যও ছিল অসৎ। সে চেয়েছিল যে কোন বদনামের শিকার হয়ে কমলা বাড়ি থেকে অন্যত্র চলে যাক। আবার শান্তি মাসির শুরু হল কমলার প্রতি নির্যাতন।

উপন্যাসের শেষে উন্মাদ প্রায় কমলা কলকাতার রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। কমলা এখন অস্থির চঞ্চলা হয়ে, সাধারণ শাড়ি পরে কলকাতার রাস্তায় ঘুড়ে বেড়ায়। রাস্তায় শ্যামলী নামে এক বান্ধবীর সঙ্গে কমলার পরিচয় হয়। শ্যামলী কমলাকে মডেল হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিল। কারণ কমলার মতই মানুষের কাছে সে প্রতারিত হয়েছিল, এখন শ্যামলীর জীবনে অবনী এসেছে। অবনী পেশায় আর্টিষ্ট। সে ভালো ছবি আঁকে, জীবন সংকটের এক চরম মুহূর্তে অবনী শ্যামলীকে পথ দেখায়। অবনী ছিল নূতন পথের দিশা। অবনী ও কমলার মধ্যে গড়ে উঠল ভালোবাসা।

কমলার দ্বিতীয় যাত্রার শুরু হয়েছিল মডেল হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে। সেখানেই সে খুঁজে পেয়েছিল অবনীকে। এখন সে যেন প্রেমের আয়নার মধ্যে একা। চারিপাশে এতদিন যারা ছিল, তারা এখন ছায়ার মত ঘুরে বেড়ায়।

প্রতারিত কমলার মনে এখন দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব, কারণ অবনী তাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করবে কি না- এ নিয়ে কমলার মনে সংশয় কাজ করে। অবনীর ভালোবাসা পেয়েও শ্যামলী আজ অশান্ত। কারণ শ্যামলী চেয়েছিল আর পাঁচ-জনের মত সাংসারিক হতে। শ্যামলীকে কেন্দ্র করে কমলার মনে জেগে ওঠে নূতন করে বেঁচে থাকার ইচ্ছা। নিষিদ্ধ জগৎ এর মধ্যে থেকেও সে স্বপ্ন দেখা শুরু করলো, কমলার মধ্যে দেখা গেল অসহিষ্ণুতার ভঙ্গী। শ্যামলীকে পেয়ে সে নূতনভাবে অর্থ উপার্জন করে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল।

উপন্যাসের শেষ অংশে দেখি অবনী কমলা পরস্পরের মধ্যে একটি ঘর বাঁধার চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত অবনীকে কমলা জীবন সঙ্গী করলো। অবনীর সংস্পর্শে তার ভাঙ্গা জীবন আবার যুক্ত হল। তার জীবন আকাশে আবার নূতন তারা ফুটে উঠল।

অবনী ও কমলা পরস্পরকে ভালোবাসে। এখন তারা স্বামী-স্ত্রী। কমলার সুখে অবনী সুখ পায়, আবার দুখে অবনীর দুশ্চিন্তা আরো বেড়ে যায়। কমলা পেল স্বামী। এতদিন মডেল হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল কমলা। এখন অবনীকে পেয়ে সে ফিরে পেল নূতন জগৎ। অবনী ছিল কমলার কাছে আয়না। যে আয়নায় কমলা শুধু একাকী ভেসে উঠল। এই আয়নার সম্মুখে উদিত হতে সাহায্য করেছিল কমলার বান্ধবী শ্যামলী। শ্যামলীর বুকে একটা দুঃসহ বেদনা রয়েই গেল। অসুস্থ পিতাকে বাঁচাবার জন্য শ্যামলী মডেল হয়েছিল কিন্তু ভালোবাসার স্বর্গীয় সুখ থেকে সে চিরদিন ছিল বঞ্চিত। নিজে বঞ্চিত হয়েও কমলাকে দেখালো নূতন পথের ঠিকানা। কমলার জীবনে শ্যামলী ছিল দেবদূত। শ্যামলীর সুপরামর্শে অবনী কমলাকে কাছে নিয়েছিল। উপন্যাসের শেষে কৃতজ্ঞতাবশত কমলা জানালো -

"তুমি খুব ভালো মডেল, শ্যামলী, আমার ভাগ্যে তোমাকে পেয়েছিলাম, আচ্ছা তাহলে, এতক্ষণে আমার উপলব্ধি হল যে আমি এতক্ষণ উপলব্ধি করিনি ব্যাপারটা, কিছু না বুঝে কথা শুনছিলাম, বলছিলাম। চলে যাচ্ছো- অন্য দেশে - অনেক দূরে - পরশু। পরশু, তার মানে আজ শুক্রবার, আজই শেষ, এই মুহূর্তেই শেষ। আমি একটা চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়ালাম, মনে হল আমি খুবই দুর্বল হয়ে গিয়েছি, আমার বুকের ভেতরের কলকব্জাগুলো খুলে নিয়েছে, এই ঘরের আলোগুলো তেমন উজ্জ্বল নেই আর, অলোক পালের মুখটাও কেমন অস্পষ্ট। উনি কাশলেন একবার ট্ট অর্থাৎ, আমার যাবার জন্য

ইঙ্গিত। অন্য একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল, চেষ্টা করে কথা বের করলাম গলা দিয়ে - ছবিটা দেখতে পারি একটু ? দেখতে চাও ? আচ্ছা। তিনি ঢাকনা খুলে দিলেন। আমি একটি চোখ ধাঁধানো ঝলক দেখতে পেলাম।" - ২৩

কমলার অতীতের বিষাদের স্বর্গ ও স্বার্থপর মানুষের ষড়যন্ত্রের কথা ভুলে গিয়ে আয়নার সামনে লাল বেণারসীতে নিজেকে কেমন একা দেখতে লাগল। কমলা এখন নূতন ঘরের বধূ। ফেলে আসা দিন তাঁর কাছে স্মৃতি মাত্র। উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু দুইটি চরিত্র শ্যামলী ও কমলাকে পাশাপাশি স্থাপন করেছেন। উপন্যাসে শ্যামলীকে বুদ্ধদেব সুখহীন উড়ন্ত পাখি করেই রেখেছিলেন। উপন্যাসের প্রথম ঘটনার সঙ্গে শেষের ঘটনার কোন মিল দেখা যায় না। ঘটনাগুলি বর্ণনার মধ্যে দিয়ে পরিবর্তন এসেছে। কমলা চরিত্রের মধ্য দিয়েই বুদ্ধদেব এই পরিবর্তন এনেছেন। কমলাকে উপন্যাসে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বময়ী নারী হিসাবে তুলে ধরেছেন। অম্বু তার জীবনে বিড়ম্বনা দিলেও অম্বুই তাকে এই বিবর্তনে সাহায্য করেছিল বলা যায়। তা না হলে রাস্তায় অথবা মাসির বাড়িতে দাসী হিসাবে তাকে সারা জীবন থাকতে হত।

"নির্জন স্বাক্ষর" উপন্যাসটি ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় এবং ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দেজ পাবলোশিং, ৩১/১ বি, মহাত্মাগান্ধী রোড, কোলকাতা-৯। প্রচ্ছদ ও নামপত্র এঁকেছেন শ্রী দেবব্রত রায়। মুদ্রাকর- নিরঞ্জন বোস, নর্দাণ প্রিন্টার্স, ৩৪/২ বিডন স্ট্রীট, কোলকাতা-৬, মূল্য - ৬ টাকা।

"নির্জন স্বাক্ষর" উপন্যাসে কেন্দ্রিয় ঘটনায় সোমেন দত্ত ও মীরার দাম্পত্য জীবনকে পাই। সোমেন উপন্যাসে এক খ্যাতিমান সাহিত্যিক হিসাবে নিজেকে দাবী করে। কিন্তু তার সাহিত্য প্রতিভা ততটা উচ্চমানের ছিল না। কিন্তু সাহিত্য রচনায় তার প্রেরণা ছিল, তুলনাহীন। তার আদর্শ বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূল পরিবেশে তাকে দুর্বল বলে মনে হয়। তার স্ত্রী মীরাকে বুদ্ধিমতি সজীব ও সক্রিয় চরিত্র রূপে উপন্যাসে দেখা যায়। মীরার সামনে সোমেনকে দুর্বল ও কাপুরুষ বলে মনে হয়।

উপন্যাসের প্রথমে সোমেনকে একটি বাংলা সংবাদপত্রের কর্মী হিসাবে দেখি। সে সংবাদপত্রের প্রচার বিভাগে বিজ্ঞাপনের কাজ করে। দীর্ঘদিন এই কাজ করতে গিয়ে

তার দৃষ্টিশক্তির অপচয় ঘটে। যার ফলে তার আদর্শ ও মতামত পারিবারিক জীবনে অনেক সময় হেয় প্রতিপন্ন করে। স্ত্রী মীরার অভিপ্রায়ের কাছে বার বার সে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়।

উপন্যাসের মধ্যাংশে মালতী সেন চরিত্রকে এনে লেখক প্রেমের এক নূতন মোড় আনার চেষ্টা করেছেন। একটা চাপা ও গোপন অবচেতন মনের বিকাশ এখানে দেখা যায়। কিন্তু উপন্যাসে তার বিস্তৃতি লেখক না দেখিয়ে সোমেনের কবি মনের ও লেখক হবার স্বপ্নকেই উপন্যাসের শেষের দিকে তুলে ধরেছেন। মালতী সেন সোমেনের জীবনে একটা বুঁদ বুঁদের মত। এক দিকে সাহিত্য অন্য দিকে মালতী এই দুয়ের মধ্যে সোমেন চরিত্রের অস্থিরতার বিভিন্ন দিক উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত সোমেন মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। উদভ্রান্ত ও উন্মাদপ্রায় অবস্থায় তার আচরণগুলি অনেকটা বাস্তবসম্মত বলে মনে হয়। উপন্যাসের শেষে সোমেন আত্মহত্যার দ্বারা তার মনোবিকারগ্রস্ত জীবনের অবসান ঘটায়। উপন্যাসে স্ত্রী মীরার সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্কের অসহিষ্ণুতা ও মনোমালিন্য সোমেনকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করে। লেখক মীরার দাম্পত্য সম্পর্কের মাঝে সোমেনের কাম-সম্মোহনের অভাবকেই দায়ী করেছেন। এর ফলে তাদের সাংসারিক জীবনে অশান্তি দখা দেয়।

২) জীবনাদর্শমূলক উপন্যাস ঃ

"মৌলিনাথ" উপন্যাসটি ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসুর লেখনীর দৃঢ়তা ও সাবলীলতার ছাপ লক্ষ করি। উপন্যাসটির প্রকাশক ডি.এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কোলকাতা - ৬। দ্বিতীয় প্রকাশঃ আশ্বিন ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে।

উপন্যাসটির তিনটি খণ্ড ও একটি উপসংহার আছে।

১) একটি গ্রীষ্মের সকাল

২) একটি বর্ষার সন্ধ্যা

৩) শীতের সকাল

৪) একটি বসন্তের রাত্রি (উপসংহার)

একটি গ্রীষ্মের সকাল - পর্ব শিরোনামটি তিনটি ক্রমিক সংখ্যায় পর্বান্তর করা হয়েছে।। মৌলিনাথ কবি, সাহিত্য রচনায় সে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছে। মৌলিনাথ গীতাকে ভালোবাসে। এই ভালোবাসা চিত্রা (গীতার দিদি) মেনে নিতে পারে নি। এরই পাশাপাশি উপন্যাসে দেখা যায় বুদ্ধদেব বসু মৌলি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তার লেখক জীবনের অপূর্ণতার কাহিনী যেন আমাদের জানিয়েছেন। মৌলিনাথ ধৈর্য্যশীল ও ভাবুকী মনের লেখক। তিনি গল্প লিখেই নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। মৌলির মা গীতাকে ভালোবাসেন। মৌলি ও গীতার সম্পর্কটা সে বুঝতে পারে। মৌলির মা মৌলিকে বিয়ে করতে অনুরোধ জানায়। এমনকি গীতার সঙ্গে মৌলি বিয়েতে সম্মতি না দিলে সে বাড়ি থেকে চলে যেতে চায়। শেষ পর্যন্ত মৌলির কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে মৌলির মা বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তাই নিঃসঙ্গ বাড়িতে মৌলি একাকী রইল। মৌলিও এ বাড়ি ছেড়ে একদিন চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। মৌলিনাথ শীতের সকালে মা ও গীতাকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। নিজেকে গল্প ও সাহিত্য রচনায় ব্যস্ত রাখা ছাড়া আর কোন উপায় সে দেখে না। কিন্তু মৌলি সচেতনভাবে এই শূন্যতা সাহিত্য রচনার মধ্যে দিয়ে উপভোগ করে।

মৌলিনাথ চরিত্রে বুদ্ধদেব বসু আরো দেখালেন এই সাহিত্যের মধ্যে দিয়েই জীবনের শেষ নয়। কাজেই বাকি জীবনকে উপভোগ করার জন্য মৌলিকে চিত্রা মনের মাঝখানে স্থান দিলেন। সে চিত্রা এবং মৌলির মুখের মলিন অবস্থা দেখে দুঃখ পায়।

চিত্রা মৌলির জন্য যেন ব্যথা পাচ্ছে। তার জন্য একটা অদ্ভুত অনুভূতি সে কাউকে বলতে পারে নি। মৌলি এই সময় চিত্রার শরীরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু মৌলি তার এই কল্পনা মাঝে মধ্যে হারিয়ে ফেলে। মৌলি এখন নীরব হয়ে পড়ে থাকল। এখন সে চিত্রার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিতে চায়। চিত্রার বাড়িতে সে উপস্থিত। সেই মূহুর্তে মা নেই। মৌলি তার মানসিক অস্থিরতার বিষয়টি চিত্রাকে বুঝিয়ে বলে। চিত্রা তার মানসিক অবস্থা ভালোভাবে অনুধাবন করে, মৌলিনাথের কোন খানে অসুখ। এখন মৌলি সাহিত্য লেখা থেকে অনেক দূরে। মৌলিনাথ চিত্রাকে তার এই অবস্থার জন্য দায়ী করে না। কিন্তু চিত্রা গভীর অনুতপ্ত মনে বিষয়টি অনুধাবন করে। মৌলি নিজেকে তার মৃত হৃদয়কে উজ্জীবিত করে তুলতে চায়। বর্তমানে মৌলির সঙ্গে চিত্রার যেন কোন সম্পর্ক নেই। এই পরিস্থিতিতে লেখক মৌলির কাছে থেকে গীতাকে সরিয়ে নিয়েছিল।

উপন্যাসের শেষ অংশে আমরা দেখতে পাই গীতার সঙ্গে বিমলেন্দু নামে এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বিয়ে। মৌলিনাথ একটা দীর্ঘ চিঠি লিখে গীতা ও বিমলেন্দুকে ধন্যবাদ জানায়।

বুদ্ধদেব বসুর এই উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা গ্রন্থে লিখেছেন -

"বুদ্ধদেব বসু রচনার অজস্রতা ও অভিনব লিখন ভঙ্গী পুরাতন সীমারেখা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া উপন্যাসকে নতুন আকার দেওয়া ও নতুন পথে পরিচালিত করার কৃতিত্বে দাবী করিতে পারেন। পরিকল্পনা ও রচনা ভঙ্গীর মৌলিকতা ইহাদিগকে পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের প্রভাব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত উপন্যাস-সাহিত্য-বিবর্তনের যে প্রধান ধারা প্রবাহিত হয়েছে ইহারা সেই স্রোতের সহিত না মিশিয়া শাখা পথে পাড়ি জমাইয়াছেন। অবশ্য এই শাখাপথে স্রোতের বেগ স্থায়ী হয়ে অথবা মূল ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্যই ইহার রসপ্রবাহ অল্পদিনেই শীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া পড়িবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে তা নিশ্চিত যে ইহারা উপন্যাসের ভবিষ্যৎ পরিণতির নতুন সম্ভাবনা জাগাইয়া তুলিয়াছেন।" - ২৪

মৌলি সবসময় একটি ঘরে চেয়ারে হেলান দিয়ে আনমনা চিত্তে উদাসীনভাবে থাকত। মৌলির জীবনে তার মায়ের ভূমিকা যেমন ছিল তেমনি চিত্রার ভূমিকাও অতি গুরুত্বপূর্ণ। এই উপন্যাসে চিত্রার ছোট বোন গীতা ও ছোট ভাই বেনুকে দেখা যায়। গীতা খুব চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে। তার মধ্যে স্থিরতা ও ধৈর্য্যেরভাব ছিল না বললেই চলে। কিন্তু মৌলির সামনে এলেই যেন গীতা তার সব চঞ্চলতা ভুলে যায়। সে মৌলির সামনে হতবাক হয়ে যায়। চিত্রা এসব দেখে অবাক হয়ে ওঠে। তবে মৌলি চিত্রাকেই বেশী ভালোবাসত বলে উপন্যাসে মনে হয়। তাই চিত্রাই মৌলিকে তার ভাবনা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবিহিত করে দেবার আপ্রাণ প্রয়াস করত।

মৌলি ও চিত্রা যেন একে অপরের পরিপূরক। লেখকের দৃষ্টিতে দুজনের জন্যই যেন পৃথিবীতে প্রেম এসেছিল। মৌলি বেশিরভাগ সময়েই কবিতার সারমর্ম বুঝে আনন্দ পেতে বেশী ভালোবাসত। মৌলির ধারণা, যারা কবিতা পড়ে না, কবিতার প্রকৃত অর্থ বোঝার যারা চেষ্টা করে না, তারা কিভাবে পৃথিবীতে বেঁচে থাকে। মৌলির এই

চিন্তাভাবনা চিত্রা যেন খুব ভালোভাবে বোঝে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে চিত্রা নিজেও মৌলিকে বুঝতে বিমোহিত হয়ে পড়ে। মৌলি চরিত্রের মধ্যে কিছুটা জেদি প্রবণতা থাকলেও চিত্রার কথাকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে সে বোঝার চেষ্টা করে। চিত্রা মৌলির কাছে এম.এ. পড়েছে। মৌলি খুব মেধাবী ছাত্র। সে ক্লাসে সঠিকভাবে উত্তর দিতে না পারলেও লেখার মধ্যে তার অপরূপ প্রতিভা সে ফুটিয়ে তুলেছিল। মৌলি মাঝে মধ্যে ধৈর্য্য ও সহনশীলতা হারিয়ে ফেলত। সে এমন এক খেয়ালী চরিত্র যে নিজেও সঠিকভাবে নিজেকে চিনতে পারে না। সে কি করতে চায় তার সঠিক দিক চরিত্রের মধ্যে দেখা যায় না। সে বন্ধুদের সঙ্গেও সঠিকভাবে আচরণ করে না। কিন্তু মৌলির অদ্ভুত গুণ হলো, সকলেরই ভালোবাসা পায় ও সকলেরই প্রিয় পাত্র। বিনিময়ে সে সকলের ভালোবাসার সঠিক প্রতিদান দিতে পারে না।

মৌলি কখনও চিত্রাকে ধরে রাখতে চায় আবার কখনও গীতাকে। গীতার উচ্ছলতা মাঝে মধ্যে মৌলিকে বিস্মৃত করে তোলে। মৌলির মধ্যে একটি রহস্য শক্তি যেন তাকে বিলীন করে দেয়। তবে চিত্রা মৌলিকে সঠিকভাবে বুঝতে ও চিনতে পেরে তার ভুলগুলি সংশোধন করার চেষ্টা করে। কিন্তু মৌলি ক্ষণিকের জন্য চিত্রার বক্তব্যকে সমর্থন করলেও পরক্ষণে সে উদাস হয়ে পড়ে। চিত্রা তার কথার মধ্যে দিয়ে মৌলিকে বিয়ে করতে চাইলে সে কখনও উত্তর দেয় না। আবার চিত্রাকে সে পছন্দও করে সে কথাও জানায়। কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে বা চিত্রাকে নিয়ে সে কি করবে তা বোঝা যায় না। মৌলি কবিতা পড়তে গিয়ে বিমোহিত ও আধ্যাত্মিক চিন্তায় বশীভূত হয়ে পড়ে। সে কবিতা পড়ার সময় তার অর্থ উদ্ধার করতে গিয়ে কেঁদে ফেলে অথবা তার গলার স্বর যেন বন্ধ হয়ে যায়। উপন্যাসের মধ্য অংশে আমরা দেখি চিত্রা মৌলির জীবন থেকে স্বল্প সময়ের জন্য দূরে সরে গিয়ে আবার কাছে আসে। মৌলি তাকে তখনও ধরতে পারে নি।

মৌলি ছিল প্রকৃতি প্রেমিক, প্রকৃতির প্রতিটি জিনিসকেই সে ভালোবাসত। প্রকৃতিকে সে ঈশ্বরের দান মনে করত। তাই প্রকৃতি তাকে অপরূপ আনন্দ প্রদান করে। সে গ্রীষ্মের সকালে যেমন সৌন্দর্য খুঁজে পায়, তেমনি বর্ষার সন্ধ্যার মধ্যেও অপর এক সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করে। এসব মিলিয়ে প্রকৃতি যেন তার কাছে এক অলৌকিক আনন্দদায়ক বস্তু। আর এই আনন্দকে মৌলি তার লেখনীর মাধ্যমে সারা জীবন ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিল। তাই মৌলিও গীতাকে বিয়ে করার সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারে নি। উপন্যাসের শেষের দিকে দেখা যায় বিমলেন্দুর সঙ্গে গীতার বিয়ে। সেখানেও মৌলির

কোন দুঃখ নেই। মৌলি দীর্ঘ পত্র লিখে তাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছে। উপন্যাসে মৌলি সাংসারিক জীবন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল। কবিতা লেখাই তার জীবনের যেন মূল মন্ত্র। সে পড়াশুনায় ভালো হলেও শিক্ষকতা করা তার পছন্দ ছিল না। তাই প্রতি মুহূর্তে মৌলির মনে হতো, যারা কবিতা পড়ে না তারা পাগল হয় না কেন। মৌলি সারা জীবন এক নিঃসঙ্গ জীবনকেই বেছে নিয়েছিল, তা উপন্যাসের শেষে বোঝা যায়। চিত্রাকে শেষ পর্যন্ত সে বিয়ে করতে পারে নি।

বুদ্ধদেবের উপন্যাস অবশ্য বাস্তব বর্জিত এ কথা বলা যায় না। বুদ্ধদেব বসু তাঁর কল্পনা দিয়ে মৌলিনাথের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এই উপন্যাসে বাস্তবতা একেবারেই নেই এ কথা বলা যায় না। মৌলি জীবনের সহজ গতিপথে চলে নি। সে জীবনের গৌরবময় মুহূর্তগুলি বার বার বিশ্লেষণ করতে চেয়েছে। সে নিজের জীবনের বিশ্লেষণ নিজেই করেছে। আর এটাই ছিল এই উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু। কোন কোন সমালোচক অবশ্য এর মধ্যে রোমান্সের সুর দেখতে পেয়েছে। কিন্তু মৌলিনাথ ছিল বাস্তবতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত এক সংযমী আদর্শবান পুরুষ। বিভিন্ন ঘটনায় তার জীবনে যে ফুল ফুটেছিল, তাকে মৃত্তিকার সঙ্গে সামঞ্জস্য করে বিচার করতে দেখা যায়। তিনি উপন্যাসে যে আদর্শকে তুলে ধরেছিলেন তা রবীন্দ্রনাথের "শেষের কবিতা"-র লাবণ্য ও অমিতের সঙ্গে তুলনীয়। লাবণ্য ও অমিত রায়ের যেমন বিবাহ হয় নি, তেমনি মৌলিনাথ উপন্যাসে মৌলিনাথের সঙ্গে চিত্রা অথবা গীতার বিবাহ হয় নি।

"নীলাঞ্জনের খাতা" উপন্যাসটি বুদ্ধদেব বসু মৌলিনাথের উপসংহার রূপে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেছিলেন। ঐ সালের মে মাসেই উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক- আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ; ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-১৩, ক্রাউন সাইজ ২+১৮০, মূল্য - দেড় টাকা। মৌলিনাথ এবং নীলাঞ্জনের খাতা - এই দুইটি উপন্যাসের মধ্যেই বুদ্ধদেব বসুর নিজের জীবনের পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর কৈশোর ও যৌবনের ঘটনা এই উপন্যাসে অনুপ্রবেশ করেছিল। মৌলি চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ রূপ "নীলাঞ্জনার খাতা" উপন্যাসে সার্থকতা লাভ করেছিল।

এই উপন্যাসে নীলাঞ্জন তার খাতার মধ্যে দিয়ে নিজের জীবন কাহিনী বর্ণনা করেছেন। নীলাঞ্জন উপন্যাসে দুটি নারীকে ভালোবেসেছিল। তারা হলো মিলি ও

তাপসী। নীলাঞ্জন মিলির প্রতি প্রথম থেকেই মুগ্ধ ছিল। তবে তাপসীর প্রতিও তার আকর্ষণ কম ছিল না। তার মতে মেয়েদের বিয়ে করার অর্থ হলো, অনেকটা তাদের দাসী করে রাখা। এই দ্বৈত প্রেমিকার মাঝে নীলাঞ্জন নিজেকে অপরাধী ও ব্যর্থ বলে মনে করে। তবে নীলাঞ্জন ও মিলির প্রেমের গভীরতা অনেক বেশী ছিল - একথা উপন্যাসের মধ্যাংশে তাপসী স্বীকার করে।

এই উপন্যাসের কাহিনীতে গিরিজা মজুমদার, রাধাকান্ত ও স্বর্ণলতার পরিবারকে দেখা যায়। গিরিজার মেয়ের নাম মিলি। গিরিজাবাবু অত্যন্ত ব্রাহ্ম মনোভাব সম্পন্ন ও রোমান্টিক মনের মানুষ। সে এবং তার স্ত্রী নদীর ধারে নিঝুম রাতে বেড়াতে যেত। এর মধ্যে দিয়ে তার প্রকৃতিকে ভালোবাসার এক মানসিকতা ও আবেগ উপন্যাসে দেখতে পাই। অন্যদিকে রাধাকান্ত ও স্বর্ণলতার মেয়ের নাম তাপসী। তাপসীর জন্মের কিছুদিন পরেই তার মা স্বর্ণলতা মারা যায়। রাধাকান্তের স্নেহ যত্ন তাপসী তেমনভাবে পায় নি। কারণ রাধাকান্ত মদের নেশায় মাঝে মধ্যে মেয়ের নামও ভুলে যেত। হঠাৎ একদিন ক্লাব থেকে ফেরার পথে গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে তাপসীর বাবা মারা যায়। এই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে তাপসী বড় হয়ে উঠেছিল।

এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র নীলাঞ্জন। তার চরিত্রের বিশেষত্ব হল তিনি অনেক বিষয়েই জানেন কিন্তু কোন বিষয়েই বিশেষজ্ঞ নন। তার বাংলা ও ইংরেজীতে লেখা দু-চার খানা গ্রন্থ সাহিত্য জগতে জনপ্রিয় হয়েছিল। বিশেষকরে তার এই লেখায় মিলির মনে অসাধারণ দাগ কেটেছিল। তার বয়স এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। পঞ্চাশ বছরের এই অবিবাহিত নীলাঞ্জনের ছিপছিপে চেহারা, ধূসর চুলের বাহার নিয়ে ঠোঁটের রমণীয় হাসির আভায় মিলি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তার নরম কণ্ঠস্বর তার গাম্ভীর্যকে ব্যক্ত করে। বাংলা অধ্যাপকের অনুপস্থিতির কারণে নীলাঞ্জনকে সাহিত্য বিভাগে পরীক্ষা নিতেও উপন্যাসে দেখা যায়। তার মতে ভালোবাসা না থাকলে মানুষ বাঁচতে পারে না। তাই তার জীবনে মিলি ও তাপসী দুটি নামই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। দশ-এগারো বছর বয়সে সে হাতে লিখে একটি পত্রিকাও চালাতো - যার ভক্ত পাঠিকা ছিল মিলি। এক সময় মিলি নীলাঞ্জনের জন্য অনেক কিছু করতে রাজী হয়েছিল। তাই সে মাঝে মাঝে চাকরের হাতে সুগন্ধী কাগজের চিঠি-পত্র নীলাঞ্জনের কাছে পাঠাত। এছাড়া উপন্যাসের প্রথমে দেখা যায় নীলাঞ্জনের সঙ্গে মিলি খেলা করত। মিলি সহজ-সরল ও বড় হওয়ার পরেও তার আচার আচরণে শৈশবত্ব লক্ষিত হয়। মিলি তাপসীকেও খুব ভালোবাসত। তাকে

দিদির মতো আদর ও শ্রদ্ধা করত। শুধুমাত্র নীলাঞ্জনকে দেখা ও কথা বলার জন্য সে নীলাঞ্জনদের বাড়িতে যেত। উপন্যাসের মধ্যাংশে আমরা দেখি নীলুকে ছাড়া মিলি আর কাউকেই স্বামী হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি নয়। কিন্তু এরই মাঝে উপন্যাসে মাতৃহারা তাপসীর প্রতি নীলাঞ্জনের দুর্বলতা ছিল, তা আলোচ্য উপন্যাসের শেষের দিকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। যদিও নীলাঞ্জন প্রথমে তাপসীকে পছন্দ করে নি। তবে সে মিলিকেও বঞ্চিত করতে চায়নি। তার এই জীবন যন্ত্রণার ব্যথা তাপসী অনুভব করে। তাই তাপসী চেয়েছিল মিলি ও নীলাঞ্জনকে এক করে দিতে। শেষ পর্যন্ত নীলাঞ্জনের অপেক্ষায় তাপসী বিয়ে করে নি। আবার মিলিকে জীবন সঙ্গিনী রূপে মেনে নেবার স্পষ্ট ইঙ্গিতও উপন্যাসে দেখা যায় না।

"প্রভাত ও সন্ধ্যা" উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশ ঃ ২৫ শে বৈশাখ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ। প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১১ এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কোলকাতা ৭৩। গ্রন্থ স্বত্ত্ব ঃ প্রতিভা বসু। । মুদ্রাকর ঃ ফটো টাইপ সেটিং গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা - ৫।

এই উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র পৃথ্বীশ। সে সিংহ পরিবারের গ্রন্থাগারের একজন দক্ষ লাইব্রেরীয়ান। তার ক্যাটালগ তৈরীতে নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু জীবনের প্রথম থেকেই লাইব্রেরীয়ান হবার স্বপ্ন তার ছিল না। সিংহ পরিবারে কাজের খোঁজ নিতে গিয়ে তিনি লাইব্রেরীর দায়িত্ব পান। আলাদা স্বাদের ক্যাটালগ তৈরীতে তিনি সবসময় ব্যস্ত থাকতেন। লাইব্রেরীর নিয়ম শৃঙ্খলার ব্যাপারে তিনি সচেতন ছিলেন। এমনকি সিংহ পরিবারের লোকজনের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য ছিল। লাইব্রেরীর কর্মসূত্রে সিংহবাড়ির রাণীমা থেকে অরুন্ধতী, অনিন্দিতা, সুব্রত, গৌরী থেকে চাকর-চাকরাণী, কিরণময়ী প্রত্যেকের সঙ্গে তার একটা আত্মীয়ের বন্ধন গড়ে উঠেছিল। সিংহ পরিবারের আভিজাত্যের কথা তার সব সময় মাথায় ছিল। উপন্যাসে লাইব্রেরীর মধ্যে গোটা পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বুদ্ধদেব বসু তুলে ধরেছিলেন।

উপন্যাসের প্রথমে দেখি অলোকচন্দ্রের মেয়ে অনিন্দিতার বিয়ে। তারপর সিংহ পরিবার হতাশা ও দুর্দশায় নিমজ্জিত হতে থাকে। হেমনলিনী ছিলেন অলোকচন্দ্রের স্ত্রী। হেমনলিনী, অলোকচন্দ্র ও পুত্র নবকুমার - এই তিনটি মৃত্যুতে সিংহ পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসে। এই উপন্যাসে মা, ছেলে ও কিছু প্রিয় সখী-ভ্রাতৃবধূর পরপর মৃত্যুর

আঘাত বিমলপ্রতিভার মনে চরম আঘাত হেনেছিল। বিমলই ছিল এই উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। এর পরে ত্রিশ বছর কেটে গেলেও আরো কয়েকবার সিংহ-পরিবারে হানা দিয়েছে মৃত্যু। অবনী, শশাঙ্ক, অলোকচন্দ্রের আয়ু শৈশবেই ফুরিয়ে গিয়েছিল। আবার অনিন্দিতার দ্বিতীয় সন্তান অরুন্ধতী। তার বয়স এখন কুড়ি। হরিশঙ্কর থেকে আরম্ভ করে সত্যানন্দ ও উদ্ভিদ তত্ত্ববিদ অবনীভূষণকান্ত সকলের স্মৃতির পরিচয় উপন্যাসে দেখা যায়। এই পারিবারিক পরিমণ্ডলের মধ্যে পৃথ্বীশ লাইব্রেরীর চার হাজার বই এর ক্যাটালগ দক্ষতার সঙ্গে তৈরী করে। উপন্যাসের শেষের দিকে পৃথ্বীশ কাজ ছেড়ে দেবে ভেবেছিল। কারণ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা অরুন্ধতী লাইব্রেরীর বিশেষ কর্মচারীদের প্ররোচনায় সে প্ররোচিত হয়ে পৃথ্বীশকে কাজ থেকে সরানোর চক্রান্ত শুরু করেছিল। কিন্তু রাণীমার অনুরোধে পৃথ্বীশ সেই কাজ ছাড়তে পারেনি। কারণ এখানে এসে পৃথ্বীশ গোটা আত্মীয়র পরিমণ্ডল খুঁজে পেয়েছেন। পৃথ্বীশ ছোটতেই মাকে হারিয়েছিল এবং সে বিমাতার কাছে মানুষ হয়। যদিও সে তার বিমাতাকে কখনও মা বলে ডাকে নি। পৃথ্বীশ টিউশনি করে পড়াশুনা করেছে, তবু এখানে সে অনায়াসে ডাকছে রাণীমা, নন্দিতা দি, কিরণ দি, আর এটাই ছিল পৃথ্বীশের স্বতস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক মনের ডাক।

এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ড থেকে সপ্তম খণ্ড পর্যন্ত পৃথ্বীশের জীবনে কোন নারী চরিত্র সেভাবে আসেনি। আট ক্রমিক খণ্ডান্তরে লেখক দুজন নারী চরিত্র এনে তার জীবনের একটা দিক কাঁপিয়ে দিয়েছিল। একজন মালতী ঘোষ অপরজন শোভা। শোভার সঙ্গে গ্যারিসন রোড থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত পৃথ্বীশ ঘোরে। শেষপর্যন্ত সিংহ পরিবারে ঘরানায় পৃথ্বীশের এই আচারণ অরুন্ধতীর চোখে লাগে, কারণ অরুন্ধতী ছিল চঞ্চলা ও পরশ্রীকাতর। তাদের পরিবারে পৃথ্বীশ এইভাবে প্রভাব বিস্তার করুক এটা অরুন্ধতী চায় নি। আবার পৃথ্বীশের লাইব্রেরীর কর্মচারীরাও এটা ভালোভাবে দেখে নি। যার ফলে পৃথ্বীশ অনেকটা একাকী ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। সিংহ পরিবারের অন্য সদস্যরাও অবশ্য পৃথ্বীশকে সমানভাবে ভালোবাসে। এইভাবে পারিবারিক অশান্তির মাঝখানে সে কাজ ছেড়ে দেবার মনস্থ করে। উপন্যাসে দ্বিতীয় খণ্ডে দেখা যায় মৃগাঙ্ক ও পৃথ্বীশ নামে দুইটি চরিত্রের রাণীমার সঙ্গে মতামতের পার্থক্য ও তাদের প্রতিযোগিতা লক্ষ করা যায়। মৃগাঙ্ক মনে করে পৃথ্বীশ লাইব্রেরীর একজন সাধারণ কর্মচারী। সে অনেক বিষয়ে পৃথ্বীশকে তুচ্ছজ্ঞান করে। রাণীমার কাছে তার নামে নালিশ জানায়। রাণীমা এই অভিযোগের সত্যহীনতা বুঝতে পারে। শেষ পর্যন্ত রাণীমা

দিল্লীতে চলে যায়। পৃথ্বীশ একটা দীর্ঘ পত্র লিখে অরুন্ধতীকে দিয়ে সিংহ পরিবারের লাইব্রেরী থেকে বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু সে সিংহ পরিবারের প্রতি তার ব্যথা বেদনার ইতিহাস কখনও কাউকে বলে নি।

"শোনপাংশু" উপন্যসটি ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ঃ সুধাংশু শেখর দে'জ পাব্লিকেশন, ৩১/১ বি. মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৯। মুদ্রাকর নিরঞ্জন বোস, বিডন স্ট্রীট, কোলকাতা-৯।

"শোনপাংশু" উপন্যাসটি আদিম ও নানা জটিল বিধি নিষেধের জালে অবরুদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাহিনী নিয়ে রচিত। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা তাদের অতিনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রার জন্য ও কর্তৃপক্ষের অনমনীয় নিয়ম নীতির জালে অল্প বিস্তর বিকৃত মনোভাব পোষণ করে। গুজব শিক্ষিত সমাজে কিভাবে ছড়ায় তা এই উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই। শিক্ষক শিক্ষিকাদের পরস্পরের জীবন সম্পর্কে অশালীন কৌতূহল তৈরীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি দূষিত চক্র যেন কাজ করছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের মধ্যে নারী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা সুভদ্রা দেবী ও সম্পাদক নিত্যানন্দ মজুমদার এক প্রকার সন্দেহপ্রবণ, বক্র কুটিল মনোভাবের পাঁকে নিজেকে ডুবিয়ে ছিল। অধ্যাপকদের মধ্যে বেণীমাধব ও পোকেল চরিত্র দুটি পরস্পর বিপরীত স্বভাবের মানুষ ছিলেন। বিভিন্ন বিষয় ও জীবন অস্থিরতার দিক দিয়ে একই ভিত্তি ভূমিতে তারা দণ্ডায়মান ছিল। অপরদিকে বন্ধন অসহিষ্ণু, মনখোলা মেজাজের মানুষ সুখেন্দু গুপ্ত। তার অসতর্ক কথাবার্তা ও বেপরোয়া আচরণের জন্য সে সকলের নিন্দা ভাজন হয়েছিল। বিভিন্ন দলের অধ্যাপকদের প্ররোচনায় ছাত্ররা তাকে প্রহৃত করেছে। তার তরুণ সুলভ প্রণয়াকর্ষণ ও মানবিক স্নেহ মমতা এই নিয়মানুতান্ত্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছিল একমাত্র ভরসা। এরপর আমরা ডঃ মুখার্জ্জীর পরিবারকে দেখি। এই পরিবারটি অন্য সকলের হিংসা ও আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। অভিজিৎ ও মালতির নিষিদ্ধ প্রেম এই ছকে বাঁধা বিদ্যানিকেতনে এক তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। কারণ তারা ছিল তরুণ অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা। শিক্ষিত সমাজেরও যে অপরকে ভালোবাসার মনোভাব থাকতেপারে তা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষরা মেনে নিতে পারে নি। তাই সমগ্র উপন্যাসে প্রেম নিয়ে কুসংস্কার কাজ করে চলেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মানেই পবিত্র আদর্শের বলয়ে ঘোরা-ফেরা করা, বলয়চ্যুত হলেই সে অসভ্য- এই মানসিকতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের ছিল। যার ফলে অনেককেই শাস্তির শিকার হতে হয়। মোটের উপর জীবনের যে রূপ এই

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বুদ্ধদেব বসু দেখিয়েছেন তা প্রথাগত বদ্ধ জীবন থেকে বেরিয়ে আসার এক নূতন ঠিকানা বলা যেতে পারে। আর এই সূত্র ধরেই উপন্যাসটি তার অন্যান্য উপন্যাস থেকে ভিন্ন স্বাদ বহন করে।

৩) দাম্পত্য জীবনের প্রেম ও নূতন পথের দিশারী :

"শেষ পাণ্ডুলিপি" উপন্যাসটি ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশ ঃ ডি.এম. লাইব্রেরী, কোলকাতা।উপন্যাসটির ১৩টি খণ্ড রয়েছে। প্রত্যেকটি খণ্ড আবার ক্রমিক সংখা দিয়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

এই উপন্যাসের নায়ক বীরেশ্বর গুপ্ত। বীরেশ্বর প্রথম থেকেই উপন্যাসে বিধবা বধূ গৌরীর প্রতি যৌন তাগিদ অনুভব করেছে। অল্প বয়সে স্বামীকে হারিয়ে গৌরী দিদার বাড়িতে থাকে। উপন্যাসে প্রফুল্লের বাবা ছিল ভণ্ড প্রকৃতির মানুষ। নিজের অর্থ সম্পদকেই সে ভালোবাসত। সে ছিল হৃদয়হীন লোভী, আত্মকেন্দ্রিক ও পাশবিক শ্রেণীর মানুষ। বীরেশ্বর নিজেকে সংযম রাখতে পারে নি। বীরেশ্বরের জীবন ছিল যন্ত্রণাময়। বীরেশ্বরকে পারিবারিক প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলতে দেখা যায়। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জীবন যন্ত্রণা তার পরবর্তী জীবনকে দূষণীয় করে তুলেছিল। উপন্যাসের শেষ অংশে দেখি চাকুরীজীবি বন্ধুকে পেয়েছে বীরেশ্বর। এখন বন্ধু পত্নী অর্চনাকে সে পাগলের মত ভালোবাসে। সে তার দেহকে চায়। অর্চনাও তার প্রতি ঢলে পড়ে। বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সে অর্চনার সঙ্গে দেহ বিনিময় করেছে। এদিকে বীরেশ্বর তার বদ্ধ সংসার জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। বীরেশ্বর গুপ্ত উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের মানুষ। ছোটবেলা থেকেই সে অস্থির প্রকৃতির। সে আত্মরতি চরিতার্থ করতে কোন নীতি বা নৈতিকতার ধার ধারত না। যৌন পিপাসা তার চোখে-মুখে ও কথাবার্তায় ধরা পড়েছিল। আত্মরতির সে ছিল একনিষ্ঠ সাধক। অসভ্য চর্চা, আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাত্রার প্রতি বীরেশ্বর সব সময় আসক্ত থাকতো। এই প্রবণতা তার রক্তের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ছিল। বীরেশ্বরের পিতার অস্বাভাবিক আচরণ তাকে এই অবস্থায় এনে ছিল। তার রক্তে বয়েছিল বিদ্রোহের আগুন। কোনো ধর্ম, কোনো নিয়ম নীতির প্রতি বীরেশ্বর আত্মসমর্পণের পাত্র ছিল না। তার বাল্য প্রেমিকা গৌরীকে দেহ কামনার পাত্রী হিসেবে দেখেছিল সে। বিধবা হয়েও গৌরীকে একই দৃষ্টিতে সে দেখেছিল। অসামাজিক, নিয়ম নীতিহীন জীবন যাত্রায় সে ছিল অভ্যস্ত। মা- ছেলের পবিত্র সম্পর্ক সে সব সময় অগ্রাহ্য করেছিল। তার স্ত্রী সন্তানের

প্রতি কোন দায়িত্ব কর্তব্য আছে বলে বীরেশ্বর মনে করত না। সে ছিল স্নেহহীন, মায়াহীন, সংযমহীন পিশাচ শ্রেণীর চরিত্র। খামখেয়ালী মেজাজে বীরেশ্বর তার জীবন ভোগ করতে চেয়েছিল। অবশ্য বীরেশ্বরের মতো চরিত্র রূপায়িত করে বুদ্ধদেব বসু অপরিসীম আত্মকেন্দ্রিকতা, নীচুতা যে কোথায় গিয়ে পৌঁছোতে পারে তা এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন।

উপন্যাসের কাহিনীতে আরেকটি গতি পরিবর্তন আমরা লক্ষ করি কলেজ জীবনের একটি ঘটনা দিয়ে। উপন্যাসে দেখা যায় বীরেশ্বরের কলেজ জীবনের বন্ধু প্রফুল্ল। প্রফুল্লের স্ত্রীর নাম অর্চনা। বীরেশ্বরের হঠাৎ প্রফুল্লের স্ত্রীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার, ঘটনাতে বীরেশ্বরের অস্থির গতি লক্ষ করা যায়। প্রফুল্ল হয়তো বীরেশ্বরের মধ্যে যে পশুত্ব ছিল তা অনুধাবন করেছিল। এজন্য তার পরিবারের মধ্যে বীরেশ্বরকে স্থান দিয়েছিল। প্রফুল্লের উদ্দেশ্য ছিল পরিবারগত স্নেহ, মমতায় হয়তো বীরেশ্বর তার উদ্দাম, বর্বর, হিংসাত্মক পশু প্রকৃতিকে কিছুটা শান্ত করতে পারবে। প্রীতিস্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে প্রফুল্লের তিক্ত সাহিত্য সাধনার পথকে মসৃণ ও মধুর করে তোলার উদ্দেশ্যে বীরেশ্বরকে নিজ পরিবারভুক্ত করেছিল। বন্ধু বীরেশ্বরের মধ্যে দিয়ে প্রফুল্ল সুস্থ মানুষের ছন্দ আনতে চেয়েছিল। কিন্তু বীরেশ্বরের মনে মানুষের প্রতি অনীহা এতটাই বদ্ধমূল ছিল যে বন্ধুর ভালোবাসা সে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাই অর্চনার প্রতি তার আকর্ষণ একটা বিধ্বংসী, নির্লজ্জ দেহ কামনার শিখায় জ্বলে উঠেছিল। বীরেশ্বর দাবানলের মতো প্রফুল্ল ও অর্চনার সংসার পুড়িয়ে ছাই করে দিল। সেই দাবানলে বীরেশ্বর নিজেই পুড়ে তিলে তিলে ছাই হল। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় বীরেশ্বর মাতাল। মাতলামি করে গাড়ি চালানোর ফলে যে দুর্ঘটনা ঘটলো তার পরিণতিতে প্রফুল্ল ও অর্চনার মৃত্যু, গুরুতর আহত হল বীরেশ্বর। তার মস্তিষ্কে বিকৃতি ঘটল। কিছুদিন উন্মাদ চিকিৎসালয়ে আশ্রয় নিয়ে বীরেশ্বর আত্মহত্যার দ্বারা তার মনোবিকারগ্রস্ত জীবনের অবসান ঘটায়। প্রফুল্ল ও অর্চনার আত্মরতির উপাদান তার ভোগ ইচ্ছার ইন্ধন মাত্র- এখানে কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি সত্তা ফুটে ওঠেনি। উপন্যাসে যে তীব্র আলোটা বীরেশ্বরের মুখে বিক্ষিপ্ত হয়েছিল তার আভা লেখক উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রের উপর ফেলেছিলেন। বীরেশ্বরের অদ্ভুদ উন্মাদপ্রিয় জীবনের কোন ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। তার আচরণ কোন সময়েই স্বাভাবিক ছিল না। কোন অজানা হতাশা, অতৃপ্তি তার মনকে প্রতিরোধ-পরায়ন করে তুলেছিল। প্রফুল্ল ও অর্চনা যেভাবে তাকে সৎ জীবনে, সৎ পথে, ফেরানোর জন্য প্রশ্রয় দিয়েছিল তা প্রশংসনীয়। সুতরাং উপন্যাসে সমস্ত ঘটনাটি যেন কোন এক পাগল বিকৃত বুদ্ধিসম্পন্ন

মানুষের সঙ্গে অভিনয় প্রদর্শন। বীরেশ্বর যে সাহিত্যিক ছিল, বুদ্ধদেব সে দিকটা উপন্যাসে বড় করে দেখান নি। লেখক তার বীভৎস, কদাকার চরিত্রের বিভিন্ন দিক উপন্যাসে দেখিয়েছেন। প্রফুল্ল ও অর্চনার দুইটি ছেলে মেয়ে ছিল, অথচ তৃতীয় চরিত্র হিসাবে বীরেশ্বর কিভাবে সংসারে ফাটল ধরাল তার ব্যাখ্যা উপন্যাসে পাওয়া যায় না।

"শেষ পাণ্ডুলিপি" উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু নিজের জীবনের জয়গান গেয়েছেন। তিনি যেন বিভিন্ন প্রকৃতির লেখকদের নিয়ে জীবনী রচনা করেছেন। বীরেশ্বর গুপ্ত ছেলেবেলা থেকেই দুর্দান্ত উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির যৌন আগ্রহী মানুষ। নীতিহীনতা বীরেশ্বরের রক্তে যেন সবসময় বয়ে চলেছে। তার কোন সামাজিক বাধা নিষেধের ভ্রূক্ষেপ নেই। সুস্থ জীবনবোধ তার বাল্যকাল থেকেই ছিল না। বাল্য জীবনে পিতার অনুশাসন ও আচার-আচরণ বীরেশ্বরকে আরো রাক্ষুসে মনোভাব তৈরীতে বাধ্য করেছিল। তার মাতার অসহায় আচরণ তার রক্তের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। প্রেমিকার প্রতি বীরেশ্বরের আসক্তি আরো বীরেশ্বরকে বর্বর করে তুলেছিল। পারিবারিক অশান্তি ও মর্যাদা লঙ্ঘনই তাকে ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয় নি। বীরেশ্বরের বন্ধু প্রফুল্লের সংসারকে এই রাগে বীরেশ্বর শেষ করে দিয়েছিল। স্বাভাবিক ভাবে মানুষের মধ্যে যে স্নেহ, সংযম, কর্তব্যবোধ থাকা দরকার তা বীরেশ্বর চরিত্রে আমরা দেখতে পাই না। সাহিত্য সাধনাকে উপাদান রূপে গ্রহণ করে বুদ্ধদেব অস্বাভাবিক একটি জীবন কাহিনী উপন্যাসে রচনা করেছেন। বীরেশ্বরের মনোভাব পরিবর্তনের জন্যই প্রফুল্ল তাকে প্রশ্রয় দিয়েছে।

অর্চনার কাছে প্রফুল্ল ছিল পতিপ্রাণাগত। চোখের মণির মতো প্রফুল্ল অর্চনাকে কাছে রাখত, ভালোবাসত। কিন্তু প্রফুল্লের বন্ধু বীরেশ্বর তার কোমল মনের সুযোগ নিয়ে সবসময় বিষিয়ে দিয়েছে। প্রফুল্ল ও অর্চনার সংসার জীবনে বীরেশ্বর আগুন লাগিয়ে দেয়। অর্চনা সেই জ্বলন্ত অগ্নিশিখা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। নিজের স্বামীর ঘর করে ভালোবাসতে গিয়ে ঐ শিখায় দগ্ধ হতে হল অর্চনাকে।

"শেষ পণ্ডুলিপি" উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু আরো দেখালেন স্বামীর প্রতি কটু দৃষ্টি রাখতে গিয়ে সংসার জীবনে বিপর্যয় । বুদ্ধদেব সংসার জীবনে অর্থাৎ দাম্পত্য জীবনে অবৈধ প্রেম থেকে নায়ক-নায়িকাকে কখনও সুখী হতে দেন নি বরং নিঃসঙ্গতা অনুতাপ জর্জরিত হয়ে নূতন শিক্ষা নিতে বলেছেন। বুদ্ধদেব প্রীতিস্নিগ্ধ পরিবেশে দাম্পত্য

জীবনের সুখ কখনও আনেন নি। সুহৃদ, জ্বালাহীন প্রেম দিয়ে দাম্পত্য জীবনকে তিনি তবু বাঁধতে চেয়েছেন, কিন্তু অবৈধ ভালোবাসা কিভাবে সংসার জীবনকে শেষ করে দেয় তা আমরা বুদ্ধদেবের আগের অনেক উপন্যাসে দেখেছি। বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসে বীরেশ্বরের মধ্যে বর্বরতা দেখালেও সেই চরিত্রে দেখিয়েছেন সাহিত্য আলোচনা ও সাহিত্য চর্চার আকর্ষণ।

প্রফুল্ল ও বীরেশ্বরের আচরণের উপাদান নিয়ে বুদ্ধদেব বসু রচনা করেছেন ভোগী জীবনের দাসত্ব। যে যৌন ভোগে অর্চনা ধরা পড়ে, বীরেশ্বর তার সেই অস্বাভাবিক আচরণ সম্পর্কে সচেতন নয়, অনেকটা উম্মাদের মতো, অস্থির চিত্তের মতো অনুচিত কাজকর্ম সে চালিয়ে যাচ্ছে। তার আন্তরিকতার কাছে সংসার ধর্ম, মানবিক ধর্ম সবই পরাভূত হয়েছে। অর্চনার মনে দুটি স্তর ছিল। একটি বীরেশ্বর ও অর্চনার দৈহিক মিলন ও অবৈধপনার ফলে ধ্বংস হয়ে যায়। আর অপরটি ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে তার নিজের সংসারকে আরো ভালোভাবে গ্রহণ করতে শেখার কোন পথ লেখক এখানে দেখান নি।

বুদ্ধদেব বসুর "শেষ পাণ্ডুলিপি" উপন্যাসের নায়ক লেখক বীরেশ্বর গুপ্তের স্বীকারোক্তির মধ্যে শূন্যতাবোধের পরিচয় মেলে। পিতার প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণা, বিমাতার প্রতি তার আকর্ষণ ও দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন, বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও বন্ধু পত্নী অর্চনার প্রতি তীব্র অবৈধ প্রেমাকর্ষণ, আত্মকেন্দ্রিক বীরেশ্বর গুপ্তকে জটিল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে। তাই এই উপন্যাসের নায়কের উপলব্ধি হয় যে, শুধু নিঃসঙ্গতা ও শূন্যতা চিরদিন মানুষের মনে থাকতে পারে না। তা থেকে একদিন সে বেরিয়ে আসবেই। এই ধারণা বুদ্ধদেবের অন্য উপন্যাসে থাকলেও এই উপন্যাসে দেখা যায় না।

"রাত ভ'রে বৃষ্টি" - উপন্যাসটি ষাটের দশকে লেখা লেখা তার বিখ্যাত উপন্যাসের অন্যতম। ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বুদ্ধদেব বসু ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মে মাস থেকে "রাত ভ'রে বৃষ্টি" উপন্যাসটি লিখতে শুরু করেছিলেন। প্রকাশক ঃ সুধাংশু শেখর দে, দেজ পাব্লিকেশনের পক্ষে, ৩১/১ বি. মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৯। মুদ্রাকর নিরঞ্জন বোস, বিডন স্ট্রীট, কোলকাতা-৬।

"রাত ভ'রে বৃষ্টি" উপন্যাসটির বিরুদ্ধে ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কোলকাতার বাসিন্দা নীলাদ্রি গুহ অশ্লীলতার অভিযোগ এনেছিলেন এবং ঐ বছরই এই উপন্যাসের বিরুদ্ধে

তিনি আদালতে মামলা দায়ের করেন। মামলা নং সি/৪৬৭ (১৯৬৯)। এছাড়া এই উপন্যাসের বিরুদ্ধে ল'কলেজের এক ছাত্র আদালতে মামলা এনেছিলেন।

এই সময় বুদ্ধদেব বসুর মানসিক অবস্থা ভালো ছিল না। এ বয়সেও তাঁর লেখার জন্য আদালতে যেতে হবে তা তিনি ভাবতে পারেন নি। যাই হোক এবারও তিনি এই মামলায় জয় লাভ করেছিলেন। এবার আমরা এই উপন্যাসটি বিশ্লেষণ করবো।

"রাত ভ'রে বৃষ্টি" উপন্যাসে মালতী ও নয়নাংশু দাসের একটা দাম্পত্য জীবনের চিত্র বুদ্ধদেব বসু তুলে ধরেছেন। লেখক এই উপন্যাসে নায়ক নায়িকাদের বয়সের যে পরিচয় দেন তা হল- মালতীর বয়স মাত্র বত্রিশ এবং নয়নাংশুর সাঁইত্রিশ। ওদের মেয়ে বুন্নির বয়স মাত্র সাত।

নয়নাংশু ও জয়ন্ত এক সময়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। কিন্তু কলেজ জীবনে নয়নাংশুর সঙ্গে অপর্ণা নামে মেয়ের সম্পর্কের কথা মালতীর মুখ থেকে পাই। স্বামী হিসেবে মালতি নয়নাংশুর কাছে থাকলেও, মালতী প্রেমিক হিসেবে জয়ন্তকে দেখেছিল। জয়ন্ত মা হারা দরিদ্র পরিবারের সন্তান। সে টাকা পয়সার অভাবে বি.এ. পড়া ছেড়ে দিয়েছিল, এখন সে ডেটিন্যু করে, মাঝে ট্যাক্সিও চালায়। সুতরাং মালতীর চোখে জয়ন্ত একজন কর্মবীর। একসময় জয়ন্তর প্রশংসা করেছিল নয়নাংশু। নয়নাংশুর মাধ্যমেই মালতীর সঙ্গে জয়ন্তের পরিচয় হয়। ক্রমে পূর্ণযৌবন প্রাপ্তা মালতী জয়ন্তর দিকে ঢলে পড়ে। জয়ন্ত ও মালতীর আসক্ত নেশা নয়নাংশু সব বুঝতে পারে, এবং নিজে এ বিষয়ে দূরে থাকতে চায়। এখন মালতী পুরুষ হিসাবে জয়ন্তকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে। যদিও নয়নাংশুর সঙ্গে মালতীর কলেজ জীবনে নিবিড় প্রেম শেষ পর্যন্ত বিয়েতে পরিণত হয়েছিল।

উপন্যাসের মধ্য অংশে আমরা জানতে পারি নয়নাংশুর উপর মালতীর প্রেম ছিল অন্য মেয়েদের সঙ্গে তার রেশারেশির ফল। কিন্তু জয়ন্তর প্রতি তার ভালোবাসার অন্ত নেই। নয়নাংশু গান ভালোবাসে না। অবশ্য এই গান ভালো না লাগার বিষয়টি মালতীর জয়ন্তর প্রতি ঢলে পড়ার অর্থ হতে পারে না বলে আমাদের মনে হয়।

উপন্যাসের মধ্যাংশে দেখি নয়নাংশু তার অসুস্থ পিসিমাকে দেখতে যায়। এই সময় জয়ন্ত তার বাড়িতে এসে মালতীর সঙ্গে দেহ বিনিময় করে। এই ঘটনা ক্রমে

মালতীকে তার স্বামীর প্রতি অনেকটা বিমুখ করে তোলে। তখন থেকে জয়ন্ত মালতীর কাছে প্রাণ ও আলো। এখন অচেতন ও সচেতন মনে জয়ন্তকে সে ভালোবাসে। জয়ন্ত মালতীর নেশায় এখন নয়নাংশুর বাড়িতে আসা যাওয়ার কোন বাধা রইল না। এখন মালতীর বাড়িই হল জয়ন্তের প্রেমের উদ্যান।

এই উপন্যাসে আরেকটি উপকাহিনী পাই, যা উপন্যাসের ঘটনাকে তেমনভাবে নাড়া দেয় নি। এখানে দেখা যায় লেখক কলেজ জীবনে কুসুমকে ভালোবেসেছিল। কুসুম বয়সে ছোট হলেও সম্পর্কে মাসি। কিন্তু সুব্রত যেভাবে মনিকার সঙ্গে প্রেম করেছে কুসুম সেভাবে মিশতে চায় না কিন্তু শেষের দিকে সে লেখকের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু লেখক কুসুমের কাছে আত্ম সংবরণ করতে বাধ্য হয়েছে। কুসুমের বিয়ে হল। বিয়ের পর সুব্রতর প্রতি তার সামান্য আকর্ষণ থেকে গেছে।

এখন জয়ন্ত মালতির মনের মাঝে উজ্জ্বল নক্ষত্র, এখন নয়নাংশু মাতাল বলে জয়ন্তকে তার বাড়ি থেকে তাড়াতে চেয়েছিল। এই সময় জয়ন্ত মালতীকে নিয়ে পালিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখে। জয়ন্ত মালতীকে ভালোবাসে না, আজ তার দেহকে ভালোবাসতে চায়। আগ্নেয়গিরির লাভার মতো সে তার শরীরকে দহন করে চলেছে। মালতির চোখে জয়ন্ত এখন পুরুষ। জয়ন্তর কাছে ভালোবাসা ছিল জৈব, ভালবাসা তার কাছে যৌন। জয়ন্তর কথায়, শরীর না থাকলে কিছুই থাকে না ভালোবাসার। বিদ্যুতের মতো শরীরের সঙ্গে যোগ না থাকলে তার কোন মূল্য নেই। তাই জয়ন্ত আজ মালতীর দেহকে হিংস্র প্রাণীর মতো শোষণ করে চলেছে। রক্তে-রক্তে, শিরায়-শিরায় মালতীর দেহ সে উপভোগ করছে। মালতী আলস্য নারীর মতো তার জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছে। জয়ন্তকে পেয়ে সে উপভোগ করেছে, বিয়ের পর প্রেমের মৃত্যু হয় না। বৃষ্টি ঝরে গেলে আবার মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরতে পারে জয়ন্ত এই বিশ্বাসে মালতীর জীবনকে পেতে শুরু করলো -

"জয়ন্তর জন্য মালতীর প্রতিটি অঙ্গ আজ ব্যাকুল, মালতী আজ স্বাধীনভাবে দেহ বিনিময় করে জয়ন্তকে পেতে চায়। মালতীর চোখে জয়ন্ত আজ তুমি স্বাধীন, তুমি নির্ভীক - আমার জয়ন্ত! আমার প্রাণ! আমার আলো ! তোমার জন্য আমার তেষ্টা পাচ্ছে, এই বৃষ্টির শব্দে তেষ্টা পাচ্ছে। আমারা - চল যাই সুড়ঙ্গে, আবার যার ছাদ ফেটে স্রোত নেমে আসে - আমার তেষ্টা পাচ্ছে, কিন্তু জল আছে খাবার ঘরে আমি কেমন করে উঠে যাই, যদি নয়নাংশু নড়ে ওঠে, কিছু বলে বা কোনভাবে আমাকে বুঝতে দেয় যে সেও ঘুমায় নি

- যদি বাধ্য হই কিছু বলতে, যদি খোলাখুলি কিছু জিজ্ঞেস করে নয়নাংশু - না, এখন চাই না, কোন কথা কাটা কাটি চাইনা এখন, আমি এখন ভালোবাসছি,- আমাকে ভালোবাসতে দাও, শুয়ে-শুয়ে তোমাকে ভালোবাসছি।" - ২৫

এইভাবে উপন্যাসের শেষ অংশে পিসীর বাড়িতে নয়নাংশু আবার চলে যেতে চাইলে বুন্নি তাদের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই বুন্নির অনুরোধেই মালতি ও নয়নাংশু সঙ্গে জয়ন্তকে নিয়ে বুন্নি বেড়াতে গিয়েছিল। বুন্নি তাদের মধ্যে খানিকটা মিলন এনে দিয়েছিল। বুন্নির দিকে তাকিয়ে মালতির মনে ভাবান্তর ঘটল। তার মা ডাকের মধ্যে দিয়ে নয়নাংশুর মুখের ছায়া ভেসে আসে। মালতী জয়ন্তের সঙ্গে অবৈধপনায় যুক্ত হলেও সে ছিল কুসংস্কার মুক্ত মনের মহিলা, জয়ন্তর বুন্নিকে নিয়ে তার যেন নয়নাংশুর স্মৃতি বহন করে। সে নিজের স্বামীর স্মৃতি বুন্নিকে দিয়ে উপলব্ধি করে। হঠাৎ মালতীর মনে ভাবান্তর ঘটে। পুরুষকে হঠাৎ বোকা বলে মনে হয়। বুন্নিকে জড়িয়ে ধরে সে যেন অন্য জগতে চলে যায়। হঠাৎ সে নূতন কিছু আবিষ্কার করে চলেছে। -

"ছিঃ কি ভাবছি! অংশুতো কোন ক্ষতি করে নি আমার। ও ভালো, কিন্তু ওর ভালোত্ব তেমন কাজে লাগেনা - এই হয়েছে মুশকিল, কাজে না লাগার অর্থই বা কি ? আমি কি ওকে ছেড়ে গিয়েছি, না কি যেতে পারি, না কি ও-ই আমাকে কখনও বলবে চলে যাও ? না-কেউ যেন কল্পনাও না করে আমি সংসার ভেঙ্গে দেবো ! তা কি করে হয় - আমিতো বুন্নির মা। আমার জামাই হবে একদিন, কুটুম্ব হবে, নাতি-নাতনি হবে। এই সংসার আমার - তিলে তিলে আমি একে গড়েছি, সাজিয়েছি, বাড়িয়েছি। আমি অংশুর স্ত্রী - থাকবো চিরকাল - সব জেনে, সব বুঝেও অংশুকে থাকতে হবে আমার স্বামী সেজে। এই ওর শাস্তি, এই আমারও শাস্তি। আর শান্তিও এতেই।

এখন সে উপলব্ধি করেছে জয়ন্ত তার দেহকে কামনা করছে। এখন সে উপলব্ধি করে আমরা স্বামী-স্ত্রী আমার সন্তান আছে।

ঐ দেখো জীবন আমাদের অপেক্ষায় - রাত ভরে অপেক্ষায়- এসো তাকে তুলে নিই আমরা, জড়িয়ে ধরি পরস্পরের মধ্যে তোমার ঠোঁট দুটি ফুলের মতো খুলে গেল এগিয়ে এলো, অন্ধকারে তোমার কান্না ভেজা নরম হাসি - না, কথা না, ক্ষমা চেয়ো না, মালতী এসো-।" - ২৬

জয়ন্তের লালায়িত দেহ কামনা. মালতীকে বিতৃষ্ণার মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। মালতী যেন অচেনা দেশে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিল। জয়ন্তর নেশায় সে সংসারে ভালো মন্দ সব ভুলে গিয়েছিল।

মালতীর এই ভাবান্তর উপন্যাসের মধ্যে একটা গতি এনেছিল। উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু দেখিয়েছেন গভীর পারিবারিক সংকট কিভাবে একটা সংসারকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। যতক্ষণ না মানসিক পরিবর্তন হয় তা থেকে বাঁচার কোন নিশ্চয়তা নেই কোন পরিবারের। লেখক এই সত্যটিকে মালতীর পরিবারের মধ্যে দেখিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আরো বলা যায় নয়নাংশুর ছিল ভীরু মানসিকতা। এই মনোভাব মালতীকে জয়ন্তর দিকে ঠেলে দিয়েছিল। এখন তার জয়ন্ত-মোহ ভঙ্গ হয়েছে। জয়ন্তর সঙ্গে পালিয়ে নয়, ভালোবাসাটা নিজের সংসারকে বাঁচিয়ে রেখে স্বামী-স্ত্রী জরুরী, বেঁচে থাকাটা জরুরী। এখন মালতী অনুভব করছে, সে ভুল করেছে, অবৈধ প্রেমে সে আর দগ্ধ হতে চায় না।

উপন্যাসের শেষাংশে দেখা যায় মালতি এখন নয়নাংশুর কাছে ফিরে আসছে। তার জয়ন্ত আসক্তি শেষ। নয়নাংশু এত মানসিক পীড়নের পরেও বেঁচে আছে। লেখকের চোখে নয়নাংশু মহামানব। এখন নূতন জীবনকে সাদরে গ্রহণ করতে লেখক নয়নাংশুকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। লেখকের দৃষ্টিতে বৃষ্টি আর নেই। তার সামনে ঝক ঝকে মুক্ত দিন। তাই লেখক মালতীকে নূতন ভাবে গ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছেন।

বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসে স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র বন্ধনের মাঝে তৃতীয় চরিত্র জয়ন্ত যেভাবে ফাটল ধরিয়েছিল, তা নয়নাংশুর উদারচেতা মানসিকতায় লেখক গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে জয়ন্ত মালতীর প্রেমের দৈহিক বর্ণনা প্রসঙ্গে অশ্লীল বলে মনে হলেও বাস্তবে তা নয়। জয়ন্ত ও মালতী তাই অবৈধ দৈহিক সম্পর্কের মাঝে মূলত দেহের উগ্র বর্ণনা করে লেখক দেখিয়েছেন চোখের নেশায় জয়ন্তকে সে ভালোবেসেছিল। এরপরও সংসার জীবনের ভালোবাসার বন্ধন কিভাবে অটুট থাকে সেই ধারণা লেখক এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন।। জয়ন্তের উগ্র ভোগলিপ্সা মানসিকতাকে লেখক বেশী দূর নিয়ে যায় নি। অশ্লীল সম্পর্ক বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক মালতীর দেহজ বিবরণ এ প্রসঙ্গে সমর্থন করা যায়। তবে বুদ্ধদেব বসুর মালতীর দেহ বর্ণনাই একমাত্র

উদ্দেশ্য ছিল না, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে একটা পরিবার কিভাবে নূতন জীবনে ফিরে আসে তারই বর্ণনাকে উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলা।

"বিপন্ন বিস্ময়" উপন্যাসটি ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ডি.এম. লাইব্রেরী, ৬১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কোলকাতা। প্রকাশক- শ্রী গোপালদাস মজুমদার। এই সময় বুদ্ধদেব বসুর শরীর ভালো ছিল না। উপন্যাস লিখতে হঠাৎ তাঁর ইচ্ছা হারিয়ে যায়। যে বুদ্ধদেব বসু এক বছরে পাঁচখানা উপন্যাস লিখেছিলেন, এখন সে লেখা থেকে মুক্ত থাকতে চাইছেন। এই অনাগ্রহী মনোভাব নিয়ে বুদ্ধদেব বসু "বিপন্ন বিস্ময়" উপন্যাসটি লিখলেন। এই উপন্যাসটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড ঃ "বিপন্ন বিস্ময়" নামে শারদীয় (১৯৫৯) উল্টারথ উপলক্ষে এটি প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ড ঃ "শ্রীপতি ও আরতি" - নামে ১৯৬৮ সালের শারদীয় সংখ্যায় প্রকশিত হয়। বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাস রচনা প্রসঙ্গে আরো বলেছেন -

"গ্রন্থাগারে প্রকাশের আগে উপন্যাসটিতে বহু পরিবর্তন করেছি। কোন অংশ নতুন করে লিখেছি, প্রথম খণ্ডে চতুর্থ ও দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদও নতুন।" - ২৭

বুদ্ধদেব বসুর ঐ দুটি শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত খণ্ড নিয়ে এই উপন্যাসটি বই হয়ে প্রকাশিত হলো ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে।

এই উপন্যাসে অনেকগুলি চরিত্রের সমাবেশ লক্ষ করি। উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র হিসাবে শ্রীপতিকে পাই। সে দীর্ঘদিনের রোগে শয্যাশায়ী। তার বাল্যবন্ধু দুর্গাদাস। উপন্যাসের প্রথমে দেখা যায় দুর্গাদাস, হিমেন্দু তালুকদার, গৌতম, চন্দনা ও আরতিকে নিয়ে শ্রীপতির বাড়িতে যায়। এদের সকলেই শ্রীপতির খ্যাতি ও সাহিত্যে অবদানের কথা শুনেছিল। প্রত্যেকটি চরিত্রই কম বেশী সাহিত্য লেখায় ব্যস্ত থাকে। তারা "সুনন্দা" নামক সাহিত্য আড্ডায় মিলিত হয়। তারা শ্রীপতিকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে হাজির হয়েছিল। এই পটভূমিকায় উপন্যাসটি শুরু হয়। পটভূমিকাটি ছিল দীর্ঘ দিনের প্রেম ঘটিত ব্যাপার যা শ্রীপতিকে বিতৃষ্ণায় পরিণত করেছিল। উপন্যাসে প্রেম ঘটিত ব্যাপারটি এবার আমরা দেখব। আরতি ও বন্দনা এই দুটি নারী বর্তমানে গৌতমকে নিয়ে প্রেমের প্রতিযোগিতা করছে। এই নিয়ে তাদের ঝগড়া পর্যন্ত হয়ে গেছে। গৌতম লোভী শ্রেণীর মানুষ। সে ঈর্ষা পরায়ণ। কিন্তু দুর্গাদাস কোন ব্যক্তি চরিত্রকে ভালোবাসে না, সে

সকলের সঙ্গেই মুক্ত মনে মেলামেশা করে। গৌতম, আরতি, বন্দনার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝে অনেক সময় দুর্গাদাসকে বিচারকের আসনে বসতে হয়েছে। দুর্গাদাস এলোমেলো গোছের। যখন যা মনে আসে তাই করে। কোন বাঁধাধরা ছকে সে চলার পক্ষপাতী নয়।

শ্রীপতিকে এই উপন্যাসের রোগাক্রান্ত ব্যক্তি হিসাবে দেখা গেলেও তার জীবন দর্শন ছিল সকলের থেকে আলাদা। সে ছিল বুদ্ধিমান ও মহৎ মনের অধিকারী। আরতি এক সময়ে তার কাছে পড়াশুনা করতো। শ্রীপতির লেখা বই আরতির আলমারীতে ছিল। সকলেই তার এই বই পড়ার জন্য আগ্রহী। আরতীর সঙ্গে শ্রীপতির একটা দীর্ঘ দিনের সম্পর্কের ভিত্তিতে, উভয়ের প্রতি উভয়ের একটা দুর্বলতা ছিল, যা উপন্যাসের প্রথমে আমরা দেখতে পাই। বুদ্ধদেব বসু নাটকীয় ভঙ্গীতে শ্রীপতির ভাবান্তর ঘটিয়েছেন। শ্রীপতি এখন আরতির বাড়িতে। তার সেবা যত্ন আরতি করছে। অন্যদিকে গৌতম ক্রমশ আরতিকে ছিনিয়ে নেবার চক্রান্ত শুরু করে।

শ্রীপতি এখন আরতির বাড়ির একজন সদস্য। আরতিকে এবং তার বাড়ির পরিবারকে সে নানাভাবে ভুল বোঝাবার চেষ্টা করে গৌতম। গৌতমের এই লালায়িত আকর্ষণের জন্য আরতিই দায়ী, কারণ আরতি তাকে কাছে আসার প্রশ্রয় দিয়েছিল। ঘটনাক্রমে শ্রীপতি ও আরতি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়লো। আরতির বিয়ের পর ভাবান্তর ঘটে। উপন্যাসের আরেকটি উপকাহিনীতে আমরা সুব্রত ও জয়ন্তীকে দেখি। কিন্তু তাদের মিলনের কোন দৃশ্য দেখি না। আবার আরতি শ্রীপতি বিবাহ বিচ্ছেদের পরেও তাদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। আরতি আইন সম্মতভাবে শ্রীপতির সঙ্গে বিয়ে করেছিল। কিন্তু আরতি যেভাবে শ্রীপতিকে পেতে চেয়েছিল - শ্রীপতি সেভাবে তার কাছে ধরা দেয় না। আরতি ছিল কামপ্রিয়া স্ত্রী। সে শ্রীপতিকে পরিপূর্ণভাবে পেতে চায়। বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছেন-

"আরতির যৌন লালসা আগে বেশী প্রবল ছিল না বিয়ের পর থেকে প্রবল হয়। শ্রীপতির বিশুদ্ধ সাহিত্য চর্চার জ্ঞান আহরণ করা তার মোটেই পছন্দ ছিল না। স্ত্রী জীবনকে আরতি দাসত্ব বলে মনে করেছিল। প্রেম আরতির কাছে এখন "ঘেন্না।" - ২৮

এই উপন্যাসের কোন চরিত্রকেই আমরা পরিপূর্ণ সুখ ভোগ করতে দেখি না। বিবাহ, হতাশা, নিঃসঙ্গতায় এই উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্রই ধুঁকছে। উপন্যাসের শেষ অংশে শ্রীপতির প্রতি আরতির দোটানা মনোভাব লক্ষ করা যায়। আরতির চেতনায় পূর্বস্মৃতি বার বার ফিরে এসেছিল। আরতি নিজেই এখন বলছে -

"কী-সব আবোলতাবোল ভাবছি! বাজে। আরতি চোখ ফেললো ঘড়িতে, আড়াইটা বাজতে দুই মিনিট মাত্র বাকি, লাঞ্চের ছুটি এখনই শেষ হবে - নিশ্চিন্ত। কাজের জন্য তৈরী হয়ে বসল সে; মনে পড়ল তিনটের সময় ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘরে কনফারেন্স আছে, কিন্তু তাকে কেন যেতে হবে সেখানে, তা যেন হঠাৎ মনে করতে পারলো না। - সত্যি, এই ছিলো তার অসহায় অবস্থা। আমি চলে যাবো এখান থেকে, এ-সব অবান্তর বোঝা আমি চাই না, আমি স্বাধীন থাকতে চাই। শুনেছি তেহরানে এদের একটা আপিশ খুলছে, আমি চেষ্টা করলে কি সেখানে বদলি হতে পারি না ? চলে যাব - ফিরে এসেও, চলে যাব আবার ? আশ্চর্য ! - স্মৃতি কি শুধু সুখ আর সুখের কল্পনা দিয়ে তৈরী, আমাদের সব দুঃখকে তা কি শেষ পর্যন্ত গালিয়ে দেয় ? না কি যাকে স্মৃতি বলি সেটাও ভুল, আসলে অতীত বলে কিছু নাই; প্রতি মুহূর্তই পরের মুহূর্তের অতীত; আজকের দিনটা যা হয়ে উঠছে তারই নাম হল গতকাল - আমরা সব সময় বেঁচে থাকি শুধু বর্তমানে। কিন্তু- একটা উল্টো টানওকি আসে না এক এক সময় ? যাকে মৃত বলে জানি তা যেন প্রাণ ফিরে পায়, জুলুম করে আমাদের উপর- না কি তা কখনও মরে না, ছেড়ে যায় না আমাদের, সঙ্গে থাকে, লুকিয়ে থাকে - তারপর হঠাৎ একদিন বেরিয়ে এসে আমাদের আত্মস্থতা নষ্ট করে দেয়। ঠিক, ঠিক, কলকাতায় আর নয়, আমাকে কেটে পড়তে হবে।" - ২৯

আরতির মনে এই আঘাত, বেদনা, জাগরণের একটি বিচিত্র সমাবেশ আমরা লক্ষ করি। শ্রীপতি একই রকম রয়েছে। তার পাওয়া ও হারানোর স্মৃতি প্রতি মুহূর্তে সারা শরীরে থাকলেও তার উষ্ণতা কাউকে দিতে চায় নি। এখন তারা পরস্পর বিচ্ছেদ হলেও উভয়েই উপলব্ধি করেছে যে সেটাই ছিল তাদের জীবন। শ্রীপতি উপলব্ধি করেছে তাদের জীবন প্রাণহীন, অস্তিত্বহীন শূন্যের মতো। এখন তারা বিচ্ছেদের মধ্যেও একে অন্যকে অনুভব করছে।

"বিপন্ন বিস্ময়" - উপন্যাসের মধ্যে তাই লক্ষ করা যায় শ্রীপতি-আরতির অস্তিত্বের মধ্যে আলোছায়ার টানাপোড়েন সবসময় ক্রিয়াশীল থেকেছে। শূন্যতাবোধ ও বিচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসটি শেষ হয়।

বুদ্ধদেব বসুর "গোলাপ কেন কালো" উপন্যাসটি ১৯৬৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ঃ সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিকেশন, ৩১/১ বি. মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৯। মুদ্রাকর নিরঞ্জন বোস, বিডন স্ট্রীট, কোলকাতা-৬।

এই উপন্যাসে দাম্পত্য জীবন থাকলেও অশ্লীলতার অভিযোগ প্রবলভাবে বুদ্ধদেবকে নাড়া দেয় নি। কারণ একই বছরে "রাত ভ'রে বৃষ্টি" উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটি নিয়ে বুদ্ধদেবকে যে সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছিল "গোলাপ কেন কালো" উপন্যাসটিতে তেমন কোন সমস্যা দেখা যায় না। বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসটিকে ১৬টি ক্রমিক পর্বে ভাগ করেছেন। লেখক উপন্যাসে তিনটি দাম্পত্য জীবনের ছবি তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাসে প্রত্যেকটি পরিবার পুরুষদের নিঃসঙ্গতার মাঝে কোন নারীকে অবলম্বন করে সংকট তৈরী করেছে।

উপন্যাসের প্রথমাংশে বুদ্ধদেব বসু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলন কি প্রভাব ফেলেছিল তার চমৎকার পরিচয় দিয়েছেন। রণজিৎ বসু জবানীতে বুদ্ধদেব কথা বলেছেন। এছাড়া উপন্যাসে লেখক দাম্পত্য জীবনের ফাঁকে স্বদেশী আন্দোলনের পরিচয় দিয়েছেন, উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে দেখে তা উপলব্ধি করা যায়। তিনটি পরিবারকে এই উপন্যসে লেখক দেখিয়েছেন।

১) লেখকের জবানীতে রণজিৎ এর পরিবার।

২) ফটিক ও কাজলের দাম্পত্য জীবন।

৩) অনাদিবাবুর পরিবার।

উপন্যাসের প্রথমেই দেখি রণজিৎ এর পরিবার। রণজিৎ বিবাহিত পুরুষ কিন্তু রণজিৎ এর পরিবারে মামীমা কাজলের সঙ্গে দেহ বিনিময়ের একটি অবৈধ সম্পর্ক উপন্যাসে দেখতে পাই। পরস্ত্রী লোলুপতা রণজিৎ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

অনাদি পরিবারে অনাদি বর্ধনের সঙ্গে মিতুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া চলাকালীন রণজিৎ, বুলবুল ও অমূল্যর সঙ্গে পরিচয় হয় । এই পরিবারের একটি উৎসব উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আগমন ঘটেছিল। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আর্থার জোন্স নামে এক বিদেশী। এর সঙ্গে লেখকের পরিচয় হয়। মিতুর বান্ধবী বুলবুল তীব্র ইংরেজ বিরোধী। বুলবুল স্বদেশী আন্দোলনের একজন সক্রিয় সদস্যা, সে মনেপ্রাণে ইংরেজি চর্চার বিরোধী ছিল। সুতরাং লেখকের সঙ্গে আর্থার জোন্সের সাহিত্য আলোচনা সে ভালোভাবে গ্রহণ করে নি। স্বদেশী যুগে গুপ্ত সমিতির নিয়ন্ত্রক ছিল বুলবুল। বুলবুল তীব্র ইংরেজ বিরোধী হওয়ায় রণজিৎ ও জোন্সের সঙ্গে মেলামেশা সে পছন্দ করত না। কিন্তু মিতাকে বুলবুল অন্তর দিয়ে ভালোবাসে।

উপন্যাসের প্রথমে রণজিৎ ও কাজলের দেহ বিনিময়ের একটি অবৈধ সম্পর্ক আমরা দেখতে পাই। রণজিৎ কলেজ পড়ুয়া, যৌবনের স্বতস্ফূর্ত তাড়নায় কাজলের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। রণজিৎ এর সঙ্গে আর্থারের আলোচনা মূলত সাহিত্য বিষয়ে। রণজিৎ চরিত্রের মধ্যে ইংরেজদের প্রতি দূর্বলতা লক্ষ করা যায়। সে ইংরেজদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছে এই দাবী করে।

এরপর আমরা ফটিক ও কাজলের দাম্পত্য জীবনের পরিচয় পাই। ফটিক বিলাতে পড়াশুনা করে। সে পড়তে গিয়ে কোন মেয়ের জন্য নিজ স্ত্রী কাজলকে এড়িয়ে চলে। দীর্ঘদিন বাড়িতে থাকাকালীন কাজলের মনে অনীহা, ক্রোধ পূঞ্জীভূত হতে থাকে। ফটিক বাড়িতে ফিরলে তার মা কোন মেয়ের প্রতি সন্দেহ করে। কাজল ও ফটিকের অনুপস্থিতিতে তাদের দাম্পত্য জীবনে রণজিৎ এর আবির্ভাব ঘটে। ফটিকের মধ্যে নিজ স্ত্রীর প্রতি কোন আকর্ষণ দেখা যায় না। সে যেন নূতন সাহেব সেজে বাঙ্গালী কালচারকে অবজ্ঞা করে।

উপন্যাসের শেষে অনাদিবাবুর পরিবারকে দেখি। অনাদিবাবু হোমিও ডাক্তার, স্বদেশী আন্দোলনে সে বিশ্বাসী। গোপনে তিনি স্বদেশী আন্দোলন পরিচালনা করেন। বিভাবতী দত্ত ও বুলবুল এই গুপ্ত সমিতির সদস্যা, বুলবুল আন্দোলনের অন্যতম সক্রিয় সদস্যা। উপন্যাসের শেষ অংশ নাটকীয় ভাবে মোড় নেয়। বুলবুল, রণজিৎ এর প্রেমে ব্যর্থ হয়ে মিতুর আলমারী থেকে পিস্তল চুরি করে। মিতু ছিল অনাদিবাবুর মেয়ে এবং

রণজিৎ এর প্রেমিকা। মিতু ও বুলবুলের প্রেমের প্রতিযোগিতায় বুলবুল পরাজিত হয়ে প্রতিহিংসার পথ নেয়। বুলবুল পিস্তল দেখিয়ে রণজিতকে সতর্ক করে দেয়।

উপন্যাসের শেষ অংশে আমরা দেখতে পাই মিতার চার বছরের জেল। এই দীর্ঘ নিঃসঙ্গতার মাঝে রঞ্জিৎ কাজলের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে আবার জড়িয়ে পড়ে। রণজিৎ কাজলকে যেহেতু দেহ মন সঁপেছিল তাই নূতন করে মিতুকে ভালোবাসার অভিনয় করতে সে পছন্দ করে নি। মিতুর কাছে সে আর কখনও এসে দাঁড়ায় নি। এর মধ্যেই মিতুর মা মারা যায়। স্বভাবতঃ রণজিৎ এর কাছে কোন সাড়া না পেয়ে মিতু অমূল্য নামে বন্ধুকে বিয়ে করে সুখী হতে চেয়েছিল। উপন্যাসের শেষে বুলবুল চরিত্রের কোন অবস্থান লক্ষ করা যায় না।

এই উপন্যাসের ১৫তম খণ্ডে আমরা আরেকটি নাটকীয় মোড় লক্ষ্য করি। মিতুর মা রণজিৎ কে দেখা মাত্রই বলেছেন -

"একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটেছে রণজিৎ। ওর পিস্তলটি চুরি গেছে। আমার গলা দিয়ে যেন বমি উঠে এলো কথাটা শুনে, অস্ফুটে বললাম, কি বললেন ? ওর শিকারের বন্দুক-টন্দুক অনেকদিন আগেই বেচে দিয়েছিলেন, শুধু একটি জার্মান পিস্তল হাতছাড়া করেন নি। ওর বাবার খুব শখের জিনিস ছিল ওটা, তাঁর স্মৃতি হিসাবে রেখেছিলেন। আমি কতবার বলেছি দিনকাল ভালো না, ও সব আপদ বিদায় করো, অন্তত ট্রেজারীতে জমা দিয়ে দাও, কিন্তু- মিতুর মার গলা ধরে এল, কথা শেষ হল না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম সত্যই চুরি হয়ে গেছে ? কোথাও নেই বাড়িতে ? কোথাও নেই। থাকতো ওর শিয়রে লোহার সিন্দুকে, চাবি নিজের কাছে রাখতেন, কিন্তু উনি তো একটু ভুলো মানুষ, কখনও হয়তো অসাবধানে রেখেছিলেন - কি করে হল কে জানে। উনি শেষ কবে দেখেছিলেন পিস্তলটাকে ? শেষ কবে ... ? তা তো ঠিক জানিনা আমি - ও পড়েই থাকে সিন্দুকে মাসের পর মাস, হঠাৎ খেয়াল হল তো খুলে একদিন পরিষ্কার করলেন - ঐটুকু তো সম্পর্ক। শিগগির বের করেছিলেন কি - পরিষ্কার করতে ? হ্যাঁ দিন দশেক আগে বের করেছিলেন বাবা, জবাব দিল মিতু। আজই ধরা পড়ল যে নেই ? আজই। এই খানিক আগে - সিন্দুক থেকে অন্য একটি জিনিস বের করতে গিয়ে দেখা গেল পিস্তলটি নেই।" - ৩০

বুলবুল তাদের এই সম্পর্কের মাঝে একটা নূতন প্রশ্ন চিহ্ন তুলে ধরে। তা হল রণজিৎ কে নিয়ে। বুলবুলের একতরফা ভালোবাসা রণজিৎ এর স্থূল দেহ কামনার কাছে কখনও ধরা পড়ে নি। মিতু ও রঞ্জিৎ এর ভালোবাসায় বুলবুল সৃষ্টি করল একটা ব্যবধান। বুলবুল স্বদেশী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেও মন থেকে রণজিৎ তাকে ভুলতে পারে নি। মিতু ও রণজিৎকে নিয়ে ভালোবাসার সোনালী দেশ গড়ার স্বপ্ন হয়তো শেষ হতে চলেছে - এই আশঙ্কা বোধ করেছিল। মিতুর মনে গড়ে ওঠা প্রেমের সংকলন ধীরে ধীরে জোৎস্না মাখা কুয়াশার মতো যেন ঝাপসা হয়ে এল। যেন কোন নামহীন অস্তিত্ব থেকে যখন হঠাৎ একটি ছন্দে বাধা সুন্দর পঙক্তি লাফিয়ে ওঠে কবির মনে; আর তখনই তিনি জানতে পারেন যে একটি ষড়যন্ত্র তার জীবনকে শেষ করে নিতে চেয়েছিল।

মিতু ও রঞ্জিৎ দুজনেই বুলবুলের হিংসা থেকে কোন অজানা দেশে যেতে চায়। তারা দুজনেই উপলব্ধি করেছিল হয়তো কোন হাঙ্গামা হবে, কোন অজানা কৌশল তাদের পেছনে কাজ করছে। উপন্যাসে একদিকে স্বদেশী আন্দোলন অন্য দিকে ত্রিভূজ প্রেমের আতঙ্ক উপন্যাসে একটি অস্থির পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। যুদ্ধকালীন মানুষের মনে যে অবিশ্বাস, অস্থিরতা ছিল তারই বহিঃপ্রকাশ এই উপন্যাসের নর-নারীর মধ্যে দেখতে পাই। উপন্যাসের প্রত্যেকটি নর-নারীই তাদের কাঙ্খিত ভালোবাসা পেয়ে সুখী হতে পারে নি। মিতা অমূল্যকে, রঞ্জিৎ কাজলকে পেয়ে সুখী থাকতে হয়েছিল। উপন্যাসে বুলবুলের অবস্থান শেষ পর্যন্ত কোথায় দাঁড়ায় তা লেখক দেখান নি।

৪) প্রেমের উপন্যাস ঃ

"বিশাখা" উপন্যাসটি ১৯৪৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ডি.এম. লাইব্রেরীর পক্ষে শিলাদিত্য সিংহ রায়। দে'জ পব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড় ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩। উপদেষ্টা - রবি দত্ত। প্রুফ সংশোধন রঞ্জন সরকার।

উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র বিশাখা। হৃদয়রঞ্জন ও অমলা দেবীর সুখের দাম্পত্য জীবনে বিশাখা নিয়ে এল আশার আলো। বাড়ির বড় মেয়ে বিশাখা। স্বভাবত পরিবারের স্নেহ মমতায় বড় হওয়া বিশাখা প্রথম থেকেই আদরে মানুষ হয়েছে।

বিশাখা!

না, না, আমাকে থামাতে পারবেন না আপনি- আমি - বিশাখা হঠাৎ থেমে গেলো।

তার মুখের উপর চোখ রাখল অসীম। থামলে কেন ? বলো। - কিন্তু ভেবে দেখেছ কি, সে বলার মানে কি ? বলে তুমি চলে যাবে, তা তো হতে পারে না।

বিশাখা সম্মোহিতের মতো বললে, না আমি চলে যাব না।

অসীমের দুই চোখের ভিতরের তারা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বিশ্বাসের সুরে বললে, যাবে না ? সে - সাহস তোমার আছে ? এক্ষুনি জবাব দিয়ো না - ভেবে দ্যাখো।" - ৩২

বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসে স্বামী স্ত্রীর নিঃসঙ্গতা যে জীবনের কতটা ভয়ানক হতে পারে তা দেখিয়েছেন। মানুষ যতদিন স্বপ্ন দেখে, স্বপ্নটাকে সত্য মনে হয়। কিন্তু যে মুহূর্তে জেগে উঠে বাস্তব জগৎকে দেখতে পায়, সেই মুহূর্তেই স্বপ্ন ভুলে গিয়ে সেই বাস্তবটিকেই সত্য বলে গ্রহণ করে। স্মরজিৎ বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখে ছিল, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল, কিন্তু স্নেহ ভালোবাসা সম্মানের সিংহাসনে বিশাখাকে কখনো সে বসায়নি। এখন বিশাখার মনে পড়লো অসীমই তার পৃথিবী। কারণ স্মরজিৎ জীবনে বড় ও প্রতিষ্ঠিত হয়েও সে কখনো দাম্পত্য জীবনের সাক্ষাৎ পাবে না। পরে এই ছিল বিশাখার শেষ সিদ্ধান্ত। তাই অসীম পৃথিবী, স্মরজিৎ এর কাছে অসীমই থেকে গেল। ড্রেসিং টেবিলের পড়াশুনা আর বাস্তব জীবনের তফাৎটা স্মরজিৎ এর কাছে আজ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। নিশ্চিতের মুঠি থেকে খসে যাওয়া বিশাখা স্মরজিৎকে আরো অন্ধকারে ফেলে দিল। স্ত্রীকে সংসারের কারাগারে রেখে স্মরজিৎ জীবনে বড় হতে চেয়ে ছিল, কিন্তু তার দায়িত্বজ্ঞানহীন বড়ো হওয়ার স্বপ্ন থেকে বিশাখা চেয়েছিল মুক্তি, একটু ভালোবাসা, তাই স্মরজিৎ এর ছকে ঢালা শারীরিক কুশলের চিঠি বিশাখাকে ধরে রাখতে পারে নি শেষ পর্যন্ত। বিশাখা বিবাহিতা, সে পরের স্ত্রী। কিন্তু তার সংসার জীবন তাকে বেঁধে রাখতে পারে নি।

স্বামী-স্ত্রীর সংসার জীবনের মধুরতা বিশাখা ও স্মরজিৎ এর মধ্যে দেখা যায় না। সে কর্মস্থলে স্ত্রীকে নিয়ে জীবনে বড় হতে কখনও চায় নি।

বিশাখা ও অসীমের অবৈধ যৌন আকাঙ্ক্ষার জন্য দায়ী ছিল স্মরজিৎ নিজে। বাবা হৃদয়রঞ্জন এর অনুশাসনের মাঝেও বিশাখা ও অসীম নূতনভাবে বাঁচতে চেয়েছিল। অসীম নিজেকে বিশাখার কাছে যেতে আপত্তি করলেও বিশাখার দুরন্ত যৌনাবেগে তাকে আরো কাছে আনতে বাধ্য করেছিল। শেষ পর্যন্ত অসীমের দুর্দশাগ্রস্ত শিল্পী জীবন বিশাখাকে আকৃষ্ট করেছিল। বিশাখার মা অমলা, বাবা হৃদয়রঞ্জনের সাদর আপ্যায়নে অসীম পরিবারের একজন হয়ে উঠেছিল। বিশাখার দৃষ্টিতে স্মরজিৎ মৃত। জীবন্ত মানুষের কোন আকর্ষণ সে অনুভব করে নি। জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাবে দিশেহারা হয়ে অসীমের প্রতি ঝুঁকে গিয়ে ছিল সে। স্মরজিৎ এর বিবাহিতা স্ত্রী, অন্যদিকে নিজের কন্যা হিসাবে অসীমের প্রতি বিশাখার এই অবৈধ প্রণয়াকর্ষণ হৃদয়রঞ্জন ভালো চোখে দেখে নি। কিন্তু কন্যার আর্ট শেখার সদিচ্ছা অসীমকে কাছে আসতে আরো সাহায্য করেছিল। আবার বিশাখা তার স্বামীকে কখনও নিজের কাছে টানতে পারে নি, সব সময় স্মরজিৎকে দূরে রেখেছে। যেকোন স্ত্রীরই একটি আকর্ষণীয় মুহূর্ত থাকে, যার দ্বারা পুরুষকে অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সেই গুণ বিশাখার মধ্যে দেখি না। যার ফলে সে স্মরজিৎ এর বিদেশ যাত্রা বন্ধ করতে পারে নি।

উপন্যাসের শুরুতে বুদ্ধদেব বসু প্রেমে পড়া নিয়ে হৃদয়রঞ্জনের মা বাবার মনে যে একটা সঠিক ধারণা ছিল সেই ব্যাপারটা দেখিয়েছেন। সাধারণতঃ প্রেম ব্যাপারটা বলতে আমরা বিয়ের আগেই বুঝি। বিয়ের পরেও যে প্রেমের উন্মেষ ঘটে এই বিষয়টি বিশাখা ও অসীমের প্রেম দিয়ে দেখিয়েছেন বুদ্ধদেব বসু।

"তিথিডোর" উপন্যাসটি ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল। এই উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ করেন আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১১ এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কোলকাতা - ৭৩। মুদ্রণ, প্রিন্ট ও গ্রাফ - ৯ সি. ভবানী দত্ত লেন, কোলকাতা - ৭৩। প্রচ্ছদ রূপায়নে এস্কয়ার। গ্রন্থ স্বত্ত্ব শ্রীযুক্তা প্রতিভা বসু।

উপন্যাসটি তিনটি পর্বে বিভক্ত-

প্রথম শাড়ি ঃ প্রথম শ্রাবণ

করুণ রঙিন পথ

যবনিকা কম্পমান

এই উপন্যাসে কোলকাতার এক স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের পরিচয় পাই। উপন্যাসে রাজেনবাবু বা রাজেন মজুমদার গৃহ কর্তা। শিশিরকণা তাঁর স্ত্রী। রাজেনবাবু ও শিশিরকণার সংসারে পাঁচটি মেয়ে এবং একটি ছেলে। শ্বেতা, মহশ্বেতা, সরস্বতী, শাশ্বতী, স্বাতী এবং একমাত্র ছেলের নাম বিজন। শিশিরকণার মৃত্যুর আগেই শ্বেতা, মহাশ্বেতা ও সরস্বতীর বিয়ে হয়ে যায়। তারা তখন শ্বশুরবাড়িতে থাকে। উপন্যাসের প্রথমে দেখি গৃহ কর্তা রাজেনবাবুর সংসার। তার পাঁচ কন্যা ও এক পুত্রকে নিয়ে সুখের সংসার। এই সংসারে পুত্র কন্যাদের নাবালক অবস্থায় রেখে রাজেনবাবুর স্ত্রী শিশিরকণা মারা যায়। ফলে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ে গৃহ কর্তা রাজেবনাবুর উপর। রাজেনবাবু উদার স্নেহশীল প্রকৃতির মানুষ। সে ত্যাগী, পরোপকারী। স্ত্রী শিশিরকণার মৃত্যুর পর রাজেনবাবু স্নেহ দিয়ে সন্তানদের বড় ও শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর বেদনা তিনি অন্তরে অনুভব করলেও মেয়েদের উপর তার প্রভাব পড়তে দেন নি। তিনি মেয়ে শাশ্বতীর সঙ্গে উগ্র কমিউনিষ্ট হারীতের বিবাহ দিয়েছিলেন, কিন্তু জামাই এর আচরণ রাজেনবাবুর কাছে কখনও ভালো লাগেনি। কারণ শাশ্বতীকে সে ভালোবাসে, কিন্তু শাশ্বতীর উপর হারীতের মানসিক অত্যাচার রাজেনবাবুকে বিরক্ত করে তুলেছিল। এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু একটি কমিউনিষ্ট চরিত্র অঙ্কন করে নূতনত্ব দেখিয়েছেন। ফলে পরিবারের সঙ্গে এই চরিত্রটির পদে পদে বিতর্ক লক্ষ করা যায়। কমিউনিষ্ট ভাবধারা সমাজে কিভাবে পরিবর্তন আনে হারীত চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তা বুঝতে পারি। তিনি সমাজে সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে আনতে চেয়েছিলেন। কমিউনিষ্ট মতবাদ শাশ্বতী মেনে নিলেও অন্য মতাদর্শের মানুষ রাজেনবাবু তা মানেন নি। ফলে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে মার্কসীয় মতাদর্শের বিরোধ উপন্যাসে নিঃশব্দে প্রত্যেকটি চরিত্রে প্রভাব ফেলেছিল তা বুঝতে পারা যায়। কারণ শাশ্বতী ও স্বাতীকে পাশাপাশি অঙ্কন করে বুদ্ধদেব বসু স্বাতী চরিত্রকে আরও গুরুত্ব দেবার জন্য শাশ্বতী চরিত্রটিকে হঠাৎ করে লেখক উহ্য রেখেছেন। পাঁচ বছরের মাতৃহীন শিশু স্বাতী তার জামাইবাবু অরুণকে বিবাহ করার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করে অবোধ মনের পরিচয় দিয়েছিল। এখানে চরিত্রটি অন্যান্য চরিত্র থেকে আলাদা। সে বাবার আদর, স্নেহ, মায়া, মমতায় দিদি ও দাদাদের স্নেহস্পর্শে বড় হয়ে উঠেছিল। উপন্যাসে এই ভাই বোনের সম্পর্কের ছত্রছায়ায় সে লালিত হলেও কখনও উচ্ছন্নে যাওয়ার উপক্রম হয় নি। সংযম তার চরিত্রে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। স্বাতীর কলেজ জীবন উপন্যাসে আলাদা গতি এনেছিল। কলেজ জীবনে তার প্রেম পদ্ম বিকশিত হয়েছে। স্বাতীর মনে এই প্রেম উন্মাদনার ক্রম বিকাশ খুব সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই

ঘটতে দেখা যায়। কলেজ জীবনের বান্ধবীদের মেলামেশায় তার জীবন গতিকে প্রভাবিত করতে দেখা যায় না। স্বাতী প্রভাবিত হয়েছিল কলেজের অধ্যাপক সত্যেন মিত্রের ভাবাদর্শের কাছে। সত্যেনকেই স্বাতী জীবনের জীবনসঙ্গী করতে চেয়েছিল। সত্যেন তার শিক্ষার গাম্ভীর্যে নিজেকে সুপ্ত রাখলেও স্বাতীকে সে একমাত্র অবলম্বন হিসাবে ভেবেছিল। ফলে সত্যেন কলেজের অধ্যাপক হয়েও ছাত্রী স্বাতীকে নিঃশব্দে ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে উপন্যাসে আলাদা গতি এসেছিল। তাদের এই পারস্পরিক ভালোবাসার সুপ্ত ঢেউ উভয় পরিবারকে প্লাবিত করে। পরিবারগত সম্মতি জ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে বিয়ের আয়োজন থেকে শুরু করে বিয়ের সমাপ্তি পর্যন্ত একটি উত্তেজনাহীন স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে দিয়ে ঘটতে দেখা যায়। কোন অতিরিক্ত উত্তেজনা মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা উপন্যাসে দেখা যায় না। গোটা উপন্যাসটি যেন একটি পারিবারিক সম্মেলন। বুদ্ধদেব বসু এই পারিবারিক সম্মেলনে আগত অতিথিদের স্নেহের বোন স্বাতীকে নিয়ে একটা নাটকীয় পরিবেশ অঙ্কন না করে স্বাভাবিক সুস্থ জীবনের যেন বক্তৃতা দিয়েছেন।

গৃহকর্তা রাজেনবাবু উদার ও স্নেহশীল পিতা। স্নেহ, প্রেম, মায়া, মমতা, বন্ধুত্ব এই গুণগুলি রাজেন চরিত্রে পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত ছিল। বুদ্ধদেব এই উপন্যাসে এই গুণগুলির খুটিনাটি তথ্য ও ভাব তুলে ধরেন। স্ত্রীর অকাল মৃত্যুর পর এখন অবিবাহিত দুইটি মেয়ে ও একটি ছেলে নিয়ে সংসার দায়িত্ব পালন করেন রাজেনবাবু। "প্রথম শাড়ি ঃ প্রথম শ্রাবণ" খণ্ডে শিশিরকণার মৃত্যু, শ্বেতা-মহাশ্বেতা ও সরস্বতীর বিবাহ, স্বাতীর সঙ্গে সত্যেন আর শাশ্বতীর সঙ্গে হারীতের পরিচয় পর্ব লক্ষ করি। দ্বিতীয় পর্বে সত্যেন ও স্বাতীর প্রেমের ক্ষীণ দৃশ্য লক্ষ করা যায়। সত্যেন কলেজের অধ্যাপক ছিল। তার মধ্যে বিভিন্ন অসামান্য গুণ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল।

"যবনিকা কম্পমান" খণ্ডে স্বাতীর বিবাহের আয়োজন। বিয়ে শেষ করার পর থেকে সমস্ত বিবরণ আমরা লক্ষ করি। শাশ্বতীর বিয়ে হয় এক উগ্র কমিউনিষ্ট হারীতের সঙ্গে। দেশে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হাওয়া। ব্ল্যাক মার্কেট বা কালোবাজারীদের চলাফেরায় জীবন বিপর্যস্ত। হারিত উগ্র কমিউনিষ্ট আদর্শে বিশ্বাসী। তার এই আদর্শ রাজেনবাবু ভালো চোখে মেনে নিতে পারেন নি। কাজেই হারীতের সঙ্গে শাশ্বতীর সংসারে মতের বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

এবার রত্নেশ্বরের এই সাংসারিক পরিচয়ের পর লেখক কিভাবে উপন্যাসে আরো জটিলতা এনেছিল, সেই দিকটা এখন আমরা তুলে ধরবো। ভাগ্যদোষে রত্নেশ্বরের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে। এন্ডারসন কোম্পানীর চাকুরী থেকে সে বরখাস্ত হয়ে পড়ে। রত্নেশ্বরের ঘনিষ্ট বন্ধু ছিল এন্ডার সাহেব। চাকুরী থেকে অব্যাহতি পেয়েও রত্নেশ্বর এখনও পেনশনের আশা ছাড়ে নি। বন্ধুর কাছে তিনি বিমলের চাকুরীর আবেদন করেন। কিন্তু সে ব্যর্থ হয়। এই অবস্থায় রত্নেশ্বর পেনশন ও বিমলের চাকুরীর আশা ছেড়ে দেয়। এখন সে বাড়িতে মস্তিষ্ক যন্ত্রণা নিয়ে উন্মাদের মত দিন কাটাতে থাকে। একদিকে পিতা অন্যদিকে সংসারের এই অসহায় মুহূর্তে পুত্র বিমল পিতাকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়ার এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করে। বিমল মিথ্যার আশ্রয় নিল। "এন্ডার সাহেবের কোম্পানীতে চকুরী করি" এই সংবাদ বিমল এনে বাবাকে অনেকটা সুস্থ করে তোলে। এই কৌশলটা দিদি গায়িত্রীর অজানা ছিল না। গায়ত্রীই বর্তমানে সংসার পরিচালনা করে। গায়ত্রী স্থির বুদ্ধি ও আদর্শবান মহিলা, সাংসারিক অনটনের মধ্যেও দায়িত্ববান অভিভাবক হয়ে সংসার পরিচালনা করছে। এই অবস্থায় বিমল ও গায়িত্রী দুজনেই সংসার চালানোর ভার নিল। হতাশা, ব্যর্থতার সমস্ত দায়ভার মাথায় নিয়ে বিমল ও গায়ত্রী এগিয়ে যাবার নূতন পথ আবিষ্কার করে। এখান থেকেই উপন্যাসে আরেকটি গতি লক্ষ করা যায়।

এই সংকটময় মুহূর্তে সংসার থেকে মুক্তি পাবার আশায় বিমল তার কলেজের বন্ধু অমরেশের কথা মনে আসে। অমরেশ অভিজাত পরিবারের সন্তান। দুই মাতৃ হারা বোনকে নিয়ে তাদের সংসার। সেখানে উপস্থিত হয়ে বিমল তার দরিদ্রতার পূর্ণ বিবরণ বন্ধুকে শোনানোর পর উভয় পরিবারের মধ্যে শুরু হল যাওয়া আসা। বিমলের সঙ্গে অমরেশের দুইবোন নিভা ও বিভার শুরু হলো সাহিত্য আড্ডা ও তর্ক বিতর্ক। বিমলকে ভালোবাসতে শুরু করে নিভা। বিমলের দিদি গায়ত্রীদেবী তাদের এই ভালোবাসাকে স্বাগত জানায়। বিমল দারিদ্র্যের চাপে এই ভালোবাসার ব্যাপারে সংকোচ বোধ করে। এদিকে অমরেশের সঙ্গে গায়ত্রী দেবীর একটা নীরব প্রেমের বাতাবরণ তৈরী হয়। বিমল ও নিভার প্রেমের ঘনিষ্টতা লক্ষ করে অমরেশ গায়ত্রীকে বিমলের সাথে নিভার বিয়ের প্রস্তাব করে। গায়ত্রী রাজী হলেও বিমল তার দারিদ্রের অজুহাতে নিজেকে সব সময় সরিয়ে রাখতে চায়। উপন্যাসের শেষে দেখি পরিবারগত সম্মতিতে বিমল ও নিভার এবং অমরেশ ও গায়ত্রীর বিবাহ সম্পন্ন হয়।

উপন্যাসটিতে বুদ্ধদেব বসু বিধবা গায়ত্রীকে অমরেশের হাতে তুলে দিয়ে বিধবা বিবাহের স্বীকৃতি জানিয়েছেন। বুদ্ধদেব ধনী ও দরিদ্রের অসম প্রেমকে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। প্রেমের ক্ষেত্রে যে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান নেই তা তিনি দেখিয়েছেন। ধনী মেয়ে কিভাবে দরিদ্রের সংসারকে মানিয়ে নিল, তা আমরা এই উপন্যাসে দেখতে পাই। উপন্যাসে বিমল, গায়ত্রী দেবী ও নিভা চরিত্রে বুদ্ধদেব বসু ব্যক্তিত্বের পরিচয় তুলে ধরেছেন। বিমল নিভাকে ভালোবাসলেও সে ভালোবাসার মধ্যে আলাদা কোন যৌন তাগিদ লক্ষ করা যায় না। সুবোধ ছেলের মতো নীরবে নিভাকে সে ভালোবেসেছিল। বিমলের দিক থেকে এই ভালোবাসা ছিল অপ্রকাশ্য। নিভার মধ্যে বিমলকে ভালোবাসার তীব্র আকর্ষণ লক্ষ করা যায়।

"এক বৃদ্ধের ডায়েরী" বুদ্ধদেব বসুর শেষ উপন্যাস। উপন্যাসটি ১৯৭২ সালে লেখা হয় এবং তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশ - ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে। প্রকাশক ঃ দে'জ পাব্লিশার্স, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা - ৭৩। এই উপন্যাস লেখার সময় বুদ্ধদেব বসু ছিলেন ক্লান্ত। তাঁর শরীরের অবস্থা বিশেষ ভালো ছিল না। অসুস্থ শরীর নিয়ে বুদ্ধদেব বসু উপন্যাস লেখা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই উপন্যাসে দৈনন্দিন জীবন কাহিনী নিয়ে একটি অভিজাত পরিবারের তিনি ডায়েরী রচনা করেছিলেন। অনেকে এটাকে উপন্যাস না বলে ডায়েরী বলে থাকেন।

এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু বীরেন্দ্রনাথ সিং এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ করে এঁকেছেন। উপন্যাসের প্রথমেই আমরা বীরেন্দ্র সিং এর পরিবারকে দেখি। বীরেন্দ্র সিং-এর মেয়ের নাম মায়ালতা, স্ত্রীর নাম অমলা। বীরেন্দ্র সিং-এর বোন ঊষা তাদের বাড়িতে থাকে। এই নিয়েই বীরেন্দ্রবাবুর সংসার। উপন্যাসে মায়ালতার লেখাপড়া, অভিনয় চর্চাকে নিয়ে বাড়ির সকলেই ছিল তার প্রসংশায় পঞ্চমুখ। মায়ালতা বিদেশে পড়াশুনা করে। কিন্তু সেখানে ভারতীয় সংস্কৃতি বিশেষ করে "রামায়ণ" - "মহাভারত" এর উপর আলোচনা করে সে খ্যাতি লাভ করেছিল। এরপর মায়ালতাকে দেশের বাড়িতে ফিরে আসতে দেখি। ফিরে এসেই বুদ্ধদেব বসু, মায়ালতার বিদেশ যাত্রায় যে পুরুষটি (রণেন) সাহায্য করেছিল তার পরিচয় দিয়েছেন। রণেনের সাঙ্গে মায়ালতার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্ক উভয় পরিবারের অজানা ছিল না, বিয়ে দিতেও তারা সম্মত ছিল। কিন্তু মায়ালতা বিদেশ চলে যাওয়ায় তাদের বিবাহ দূর অস্ত হয়ে পড়ে। উপন্যাসের শেষে

আমরা দেখি অভিনয় শিল্পীর প্রতি মায়ালতার ভালোবাসার ঝোঁক। রণেনই তাকে এই অভিনয় জগতে এনেছিল, কিন্তু তার কথা এখন মায়ালতা ভুলে গেছে।

উপন্যাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রণেন ও মায়ার সঙ্গে মিলন দৃশ্য দেখা যায় না। উপন্যাসের ডায়েরী লেখার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নি। বিক্ষিপ্ত তারিখের ঘটনাগুলি যুক্ত করে লেখক যেন উপন্যাসের আকার দিয়েছেন। রণেন চরিত্রের আলাদা বৈশিষ্ট উপন্যাসে দেখা যায় না। মা অমলার স্নেহের আড়ালেই মায়ালতাকে দেখা গেছে। একজন বিদেশে পড়া মেয়ের যে স্বভাব বৈশিষ্ট্য আচরণ হওয়া উচিৎ তা উপন্যাসে দেখা যায় না। বীরেন্দ্র সিং ও অমলা ঘটা করে মেয়ের বিয়ে দেবার যে আয়োজন উপন্যাসের প্রথমে দেখি উপন্যাসের শেষে সেই ইচ্ছা পূরণ হয় নি। বুদ্ধদেব বসু যেন প্রত্যেকটি চরিত্রের চূড়ান্ত মুহূর্তে পৌছোনোর আগেই ঘটনার ইতি টেনেছেন। তাই উপন্যাস হিসাবে এক বৃদ্ধের ডায়েরী ততটা সার্থক বলে মনে হয় না।

"মনের মতো মেয়ে" উপন্যাসটি বুদ্ধদেব বসুর দ্বিতীয় পর্বের প্রথম দিকের উপন্যাস। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে এই উপন্যাসটি রচিত হয় এবং ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কোলকাতা - ৭৩ । মূল্য- ৫ টাকা। উপন্যাসটি চারটি খন্ড শিরোনামে বিভক্ত। প্রতিটি খন্ডকে পৃথক গল্প বলে মনে হয়।

প্রথম খন্ড ঃ মাখনলালের দুঃখের কাহিনী।
দ্বিতীয় খন্ড ঃ গগনবরণের গল্প
তৃতীয় খন্ড ঃ অবনি ডাক্তারের বিয়ে।
চতুর্থ খন্ড ঃ সাহিত্যিকের স্বগোতক্তি।

উপন্যাসে প্রথমে দিল্লীওয়ালা, কনট্রাকটর, ডাক্তার এই তিনটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখক উপন্যাসটি শুরু করেছেন। তারপর দেখি মাখনলালের পরিবার। মাখনলালের মায়ের নাম হিরন্ময়ী দেবী। মাখনলাল হিরন্ময়ী দেবীর একনিষ্ঠ তত্ত্বাবধান ও একরকম প্রতিজ্ঞাবশত ছেলেকে বি.এ. পাশ করিয়েছিল। পাশের বাড়ির সুভদ্রবাবুর বি.কম. পাশ মালতির সঙ্গে মাখনলালের বিয়ের প্রস্তাব করে হিরন্ময়ী। হিরন্ময়ী নিজের ও বাবার বাড়ির আভিজাত্য নিয়ে অহঙ্কার করে। সে প্রতিবেশি সুভদ্রবাবুর মেয়ের সঙ্গে

মাখনলালের বিয়ে দিতে চায়। সুভদ্রবাবু কলেজের প্রফেসার। আভিজাত্য বজায় রাখতে হিরন্ময়ী প্রফেসরের মেয়ে পছন্দ করে। কিন্তু সুভদ্র বাবুর মেয়ে মালতী হীরন্ময়ী দেবী ও তার পুত্র মাখনলালকে খুব কাছাকাছি দেখেছিল। সুতরাং বিয়ে তো দূরের কথা, তাদের প্রতি একটা ঘৃণা ছিল। মালতির বাড়ির সকলকে সে কাছ থেকে দেখেছে। হীরন্ময়ী দেবী বিকল্প হিসাবে পাত্রী পছন্দে ছিল রাঘববাবুর মেয়ে। রাঘববাবু সুরা দোকানের মালিক হওয়ায় তার আপত্তি। কিন্তু প্রফেসর হিরন্ময়ীর এই প্রস্তাবে আপত্তি জানায়। হিরন্ময়ী সুভদ্রবাবুর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। ক্রুদ্ধ হয়ে নানা রকম অশালীন মন্তব্য করতে হিরন্ময়ী দ্বিধা করে নি।

কিন্তু ঘটনাচক্রে সুভদ্রবাবুকে পুলিশে ধরে নিয়ে যায়। মাখনলাল সৌজন্যের খাতিরে মালতির বাড়িতে গেলে মাখনলালকে তাদের বাড়িতে আসতে মালতি নিষেধ করে। মাখনলাল তাতে দুঃখবোধ করে না। মাখনলাল নির্বোধ শ্রেণীর চরিত্র। সে অত অপমান, দুঃখ বোঝে না। তাছাড়া মাখনের বুদ্ধি নিতান্ত ক্ষীণ, বোঝার মতো তার বোধ ছিল না।

এই খণ্ডের পরে লেখক তুলে ধরেন অবনী ডাক্তারের বিয়ে। অবনীবাবু অবিবাহিত যুবক, মা বাবা স্বর্গতা হয়েছেন। এই বাঁধনহারা সাংসারিক পরিমণ্ডলে তার উচ্ছন্নে যাবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু অবনী নিজেকে সামলে নিয়েছিল তার সংযমী চরিত্র বলে। এই গল্পে তার স্ত্রী বীণার পরিচয় পাই। সে বীণাকে কিভাবে ভালোবাসার কৌশলে এনেছিল এবং ভালোবাসা কিভাবে বিয়েতে রূপান্তরিত হলো তার রোমান্টিক বিবরণ লেখক উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। এই খণ্ডে শৈলেশবাবু ও হিরণ্ময়ী দেবীর সুখের সংসারে রমেন অবনিকে নিয়ে আসে। অবনী ডাক্তারী করতে এসেছিল বীণার। সে ক্রমে বীণার প্রেমের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। রমেনকে বিয়ের কথা বললেও সে অস্বীকার করে। এখানে বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছেন অসিত, সিতাংশু আর বিকাশ তিনজনে একজন করে মেয়েকে ভালোবেসেছিল। প্রথমে অন্তরা ও পরে মোনালিসাকে তারা তিনজনে ভালোবাসত। বুদ্ধদেব প্রত্যেক পুরুষ চরিত্রকে দিয়ে কোন না কোন মনের মতো মেয়ে খুঁজতে চেয়েছেন। প্রত্যেকটি মেয়ে অভিজাত্য পূর্ণ পরিবারের মেয়ে। তাদের মেলামেশার পরিবারগত সমস্যা নেই। তারা উচ্চশিক্ষিতা সাহিত্য চর্চায় আগ্রহী ও প্রত্যেকেই সাহিত্যিক। আবার উপন্যাসের এই খণ্ডে সেই কনট্রাকটার, ডাক্তার এবং দিল্লীর চাকুরীওয়ালা কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে ট্রেনে করে অদৃশ্য হওয়ার একটি

কাহিনী লেখক তুলে ধরেছেন। উপন্যাসে দিল্লীওয়ালা, ডাক্তার যেন এক একটি খণ্ডের ঘটনাকে পরবর্তী খণ্ডে নিয়ে যায়। এর পরেই আসে গগনবরণের গল্প। গগনবরণ চ্যাটার্জি দিল্লীতে থাকেন। তার কলকাতায় বাড়ি হলেও দিল্লীতে থাকেন। কালে ভদ্রে কলকাতায় কাজে আসেন। বাংলাদেশেই তার জন্ম। সাধারণ বাঙ্গালী ঘরেরই ছেলে। সতের বছর বয়স পর্যন্ত সে মফঃস্বলের শহরে কাটিয়েছে। তার সঙ্গে পাখি নামে মেয়ের সঙ্গে ভালোবাসার বিবরণই গল্পের বিষয়বস্তু। পাখি এখন বিবাহিত। কিন্তু তাদের মধ্যে সম্পর্কের কোন ব্যবধান ঘটে নি। পাখির বাড়ির উৎসব উপলক্ষে পাওয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গগনবরণ তার বড়িতে আসে। সেখানে পারিবারিক কথাবার্তায় তাদের পূর্বের স্মৃতি বার বার ভেসে উঠেছে।

এই তিনটি খণ্ডের মধ্যে দিয়ে বুদ্ধদেব বসু দেখিয়েছেন প্রত্যেকটি পুরুষ আপন মনের মানুষকে খুঁজতে বের হয়েছে। কখনও যুবক যুবতীরা এই প্রেমের অন্বেষণে দিশেহারা হতে দেখি, কখনও বা বিবাহিত পুরুষকে প্রেমের পূর্ব স্মৃতির রোমন্থনের মধ্যে দিয়ে মনের মতো মেয়েকে অন্বেষণ করতে দেখা যায়। তিনটি খণ্ডের মধ্যে যেন কোন সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নি। শুধু কনট্রাকটার ও দিল্লীওয়ালা চরিত্র দুটি উপস্থিতি দিয়ে লেখক যেন খণ্ডগুলির মিলন সেতু রচনা করেছেন।

"দুই ঢেউ এক নদী" এই উপন্যাসটি ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটি পারিবারিক উপন্যাস নামে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। "দুই ঢেউ এক নদী" উপন্যাসটির প্রকাশক এম.সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কোলকাতা - ৭৩। মূল্য- ৫ টাকা।

একটি পরিবারের পটভূমিকায় উপন্যাসের কাহিনী রচিত হয়েছে। দুই ভাই ও বোনের প্রণয়ের কাহিনী এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। অরুণা ও অশোক পিতা মাতার সম্মতি ছাড়া অন্য কোন পুরুষ ও নারীকে বিয়ে করে পিতার ক্রোধের শিকার হয়েছে। এতে পিতার ছেলের প্রতি ক্রোধ হলেও মাতা তাদেরকে সমর্থন জানিয়েছিল। শুধু মেয়ের পরিবার ও শ্বশুর অশোকের বাবার মধ্যে তর্ক বিতর্ক ও ঝগড়া উপন্যাসে একটি অস্থিরতার সৃষ্টি করে। অভিভাবকদের মধ্যে শুরু হয় যুক্তি-তর্কের ঘাত-প্রতিঘাত। এই ঘটনা বুদ্ধদেব বসু যে সংলাপ দিয়েছেন তার মধ্যে শব্দের পরিপাট্য ও ভাষার নৈপুণ্য

লক্ষ করা যায়। উপন্যাসের ঘটনা বুদ্ধদেবের অন্যান্য উপন্যাস থেকে আলাদা নয়। শেষ পর্যন্ত অশোকের শ্বশুরমশাই মেয়ের কাছে পাঠানো অর্থ সাহায্যে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

উপন্যাসের মধ্যে অরেকটি উপকাহিনী হলো সুমন্ত ও মায়ার পত্র বিনিময়। এর মাধ্যমে তাদের জীবন রহস্য উন্মোচিত হয়। দুটি তরুণ প্রেমের একটি মোহময় প্রীতি ব্যাকুলতা ও মেলামেশার আকুতি ধীরে ধীরে জাল বিস্তার করেছে। দুজনের চিঠিগুলি উভয় পরিবারের দিক থেকে একটি সরল নির্দোষ, প্রায় অজ্ঞাতসারে কাজ করে চলেছিল। সংসারে আর পাঁচটি ঘটনার মতো এটাকে তাঁরা দেখেছিল, কিন্তু তার পরিণতি ও কামনার উচ্ছ্বাস যখন প্রবল মাত্রায় দেখা দেয় তখন পরিবারের সকলকে ভাবিয়ে তুলেছিল। তাদের প্রেমের পূর্ণরূপ উপন্যাসে ফুটে ওঠেনি। অপরিণত বয়সের দুটি কিশোর, প্রেমের পরিমন্ডলে চলা ফেরা করলেও সুগভীর চঞ্চলতা উপন্যাসে দেখা যায় না। কিশোর প্রেমের পূর্ণ বিকশিত রূপ উপন্যাসে না দেখিয়ে বুদ্ধদেব বসু হঠাৎ যেন ছেদ টেনেছেন।

উল্লেখপঞ্জী

১) বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ, দ্বিতীয় খন্ড/ দ্বিতীয় প্রকাশ ২১ শে নভেম্বর ১৯৯২/ প্রকাশক - আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক - হরপ্রসাদ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ / পৃষ্ঠা- ৩৩০

২) বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ দ্বিতীয় খন্ড/ দ্বিতীয় প্রকাশ ২১ শে নভেম্বর ১৯৯২/ প্রকাশক - আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক - হরপ্রসাদ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ পৃষ্ঠা- ৬০২।

৩) সাড়া উপন্যাসের নূতন সংস্করণের ভূমিকা/বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ/দ্বিতীয় খণ্ড/ দ্বিতীয় প্রকাশ ২১ শে নভেম্বর ১৯৯২/ প্রকাশক - আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক - হরপ্রসাদ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ / পৃষ্ঠা- ৬০২

৪) সম্পাদকীয় কলমে, আনন্দবাজার পত্রিকা/১৪ই জানুয়ারী, ১৯৩৩

৫) আমার ছেলেবেলা/বুদ্ধদেব বসু/ প্রথম প্রকাশ মার্চ- ১৯৭৩, প্রকাশক- সুপ্রিয় সরকার, মুদ্রক- পরাণচন্দ্র রায়, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-১২/পৃষ্ঠা- ২৭

৬) বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ/৪র্থ খণ্ড/প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪/ প্রকাশক - আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক - নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা- ১১৮

৭) বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নবম পূনর্মুদ্রণ সংস্করণ ১৯৯২, প্রকাশক- রবীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা - ৭৩। /পৃষ্ঠা- ৪৫৭

৮) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ / তৃতীয় খণ্ড /দ্বিতীয় প্রকাশ ২১ শে নভেম্বর ১৯৯২/ প্রকাশক - আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক - হরপ্রসাদ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ পৃষ্ঠা- ৮৩

৯) বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ/ষষ্ট খণ্ড /প্রকাশক - আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক - হরপ্রসাদ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ , এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ / প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪/ পৃষ্ঠা-৩৭৩

১০) বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ/৫ম খণ্ড/ বিশেষ সংস্করণ - ১৯৮০/দ্বিতীয় প্রকাশ ২১ শে নভেম্বর ১৯৯২/ প্রকাশক - আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক - হরপ্রসাদ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ পৃষ্ঠা-১৫৯

১১) জীবনের জলছবি/প্রতিভা বসু/প্রথম প্রকাশ-১৯৯৫/ প্রকাশক- সুধাংশুশেখর দে, দেজ পাবলিশার্স, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠ-৩৫

১২) জীবনের জলছবি/প্রতিভা বসু, / প্রথম প্রকাশ-১৯৯৫/ প্রকাশক- সুধাংশুশেখর দে, দেজ পাবলিশার্স, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ পৃষ্ঠা- ১৬২।

১৩) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ/চতুর্থ খণ্ড/ প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪ / প্রকাশক - আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক - নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ পৃষ্ঠা- ৪৫৯

১৪) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ / দ্বিতীয় খণ্ড/ দ্বিতীয় প্রকাশ ২১ শে নভেম্বর ১৯৯২/ প্রকাশক - আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক - হরপ্রসাদ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ /পৃষ্ঠা- ২৭৩

১৫) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ / প্রথম খণ্ড/ দ্বিতীয় প্রকাশ ৯ই মে ১৯৯১/ প্রকাশক - আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক - নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ / পৃষ্ঠা- ৩৬০

১৬) ঐ / পৃষ্ঠা- ৩৬০

১৭) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ / পঞ্চম খণ্ড / প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪ / প্রকাশক - আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক - নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ / পৃষ্ঠা- ১৭০

১৮) বুদ্ধদেব বসু রচনা সংগ্রহ,অষ্ঠম খণ্ড/বুদ্ধদেব বসু প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, প্রকাশক আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১/এ বঙ্কিম চট্টপাধ্যায় স্ট্রীট, কোলকাতা - ৭৩/ পৃষ্ঠা- ৩৪৬

১৯) বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নবম পূনমুর্দ্রণ সংস্করণ ১৯৯২, প্রকাশক- রবীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা - ৭৩। / পৃষ্ঠা- ৪৫৪

২০) সত্যেন্দ্র নাথ রায় / বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা/প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০০০/দে'জ পাবলিশিং/ কোলকাতা-৭৩ / পৃষ্ঠা- ২১৫

২১) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ / পঞ্চম খণ্ড/ প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪ / প্রকাশক - আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক - নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ / পৃষ্ঠা- ৪৭০

২২) কনিষ্ঠা কন্যাকে চিঠি / ১২/০৬/১৯৭১ "কবিতা", বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত, বর্ষ-২১ সংখ্যা-১

২৩) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ / পঞ্চম খণ্ড / প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪ / প্রকাশক - আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক - নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ / পৃষ্ঠা- ২৩০

২৪) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নবম পূনর্মুদ্রণ সংস্করণ ১৯৯২, প্রকাশক- রবীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা - ৭৩। / পৃষ্ঠা- ৫৬০

২৫) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ / সপ্তম খণ্ড / প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪ / প্রকাশক - আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক - নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ / পৃষ্ঠা- ৩১৮

২৬) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ / চতুর্থ খণ্ড / প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪ / প্রকাশক - আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক - নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ পৃষ্ঠা- ৩২০

২৭) জীবনের জলছবি/প্রতিভা বসু, / প্রথম প্রকাশ-১৯৯৫/ প্রকাশক- সুধাংশুশেখর দে, দেজ পাবলিশার্স, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ পৃষ্ঠা-১১০

২৮) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ / নবম খণ্ড / দ্বিতীয় প্রকাশ ২১ শে নভেম্বর ১৯৯২/ প্রকাশক - আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক - হরপ্রসাদ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ / পৃষ্ঠা- ১১১

২৯) দশটি উপন্যাস /বুদ্ধদেব বসু, গোলাপ কেন কালো, প্রকাশক সুধাংশু শেখর দে, দেজ পাবলিকেশন, ১৩,বঙ্কিমচন্দ্র স্ট্রীট,কোলকাতা-৭৩,পৃষ্ঠা- ৪৮৫

৩০) ঐ/ পৃষ্ঠা- ১২৪

৩১) ঐ/ পৃষ্ঠা- ১২৩

৩২) তিথিডোর/ বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ / সপ্তম খণ্ড / প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪ /গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ / পৃষ্ঠা- ২৭৮

৩৩) ঐ/পৃষ্টা- ২৯০